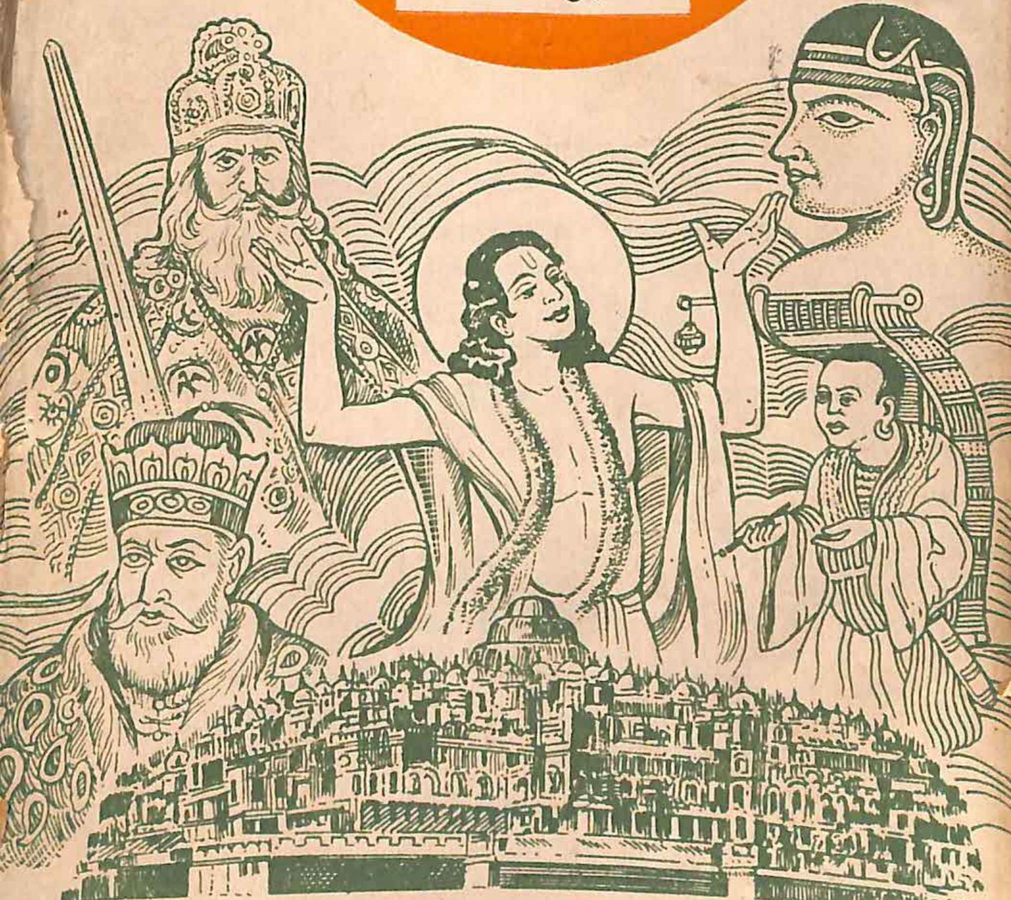
মানব সভ্যতার ইতিহাস

মধ্যযুগ



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২৮/১/৮১ তারিখের TB/No/VII/H/81/115
বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত।

মানব সভ্যতার ইতিহাস

(মধ্যযুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

হীরেন দে, এম. এ. (ট্রিপল) বি. টি,
ইতিহাসের অধ্যাপক, কালনা কলেজ (শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ) ;
ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, হুগলী গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং
কলেজ ; রিসার্চ স্কলার (এন. সি. ই. আর. টি.)
এবং 'আধুনিক যুগের ভারত'
গ্রন্থ প্রণেতা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

দেপান্তর পাবলিকেশন
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

অমর লাইব্রেরী
৫৪/৬ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

পাঠ ভবন
কালনা, বর্দ্ধমান

প্রকাশনায় ঃ
দে পাবলিকেশন ঃ ১০৯, আনন্দ পল্লী, যাদবপুর
কলিকাতা ৭০০০৩২ থেকে শ্রী এস্ এন. দে
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮১
সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৬-ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

দাম ঃ ১২·০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
দুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
অশোক সাঁতরা
৪৩/বি গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

গ্রন্থকারের বক্তব্য

আদিম সমাজ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানবজাতি যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে, মানব সভ্যতার ইতিহাস সে পথটিকে চিহ্নিত করার একটি প্রয়াস মাত্র। প্রাচীন যুগ মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন, মধ্যযুগ উহার ভবিষ্যতের রূপরেখা।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ইতিহাস পঠন পাঠনের উপর এন. সি. ই. আর. টি. পরিচালিত একটি গবেষণামূলক প্রকল্পে আত্ম নিয়োগের সুবাদে একশোটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য ঘটেছে। এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করার অন্তর্নিহিত প্রেরণা।

নতুন পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পার্থক্য ঘটেছে। নতুন পাঠ্যক্রমের আলোকে বাস্তবে তার নবরূপায়ন একটি কঠিন দায়িত্ব। দীর্ঘকাল ইতিহাস পড়াবার সুযোগ পাওয়ায় এ বইতে ছাত্র ছাত্রীর প্রয়োজন মেটাবার সনিষ্ঠ প্রয়াস রেখেছি। সপ্তম শ্রেণীর বালক-বালিকাগণ যাতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে, সে জন্য চলতি ভাষায় এই বইখানি লিখেছি। পুস্তকটির মধ্যে যদি কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, সে বিষয়ে শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনাকালে নানা জনের কাছ কেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। স্বদেশী ও বিদেশী বিভিন্ন গ্রন্থ-উদ্যান থেকে প্রয়োজনীয় অংশ চয়ন করেছি। এই ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যে অনুশীলনী রেখেছি সেগুলির চর্চা হলে বিষয়বস্তু-গুলির পুনরাবৃত্তির ফলে ছাত্র-ছাত্রীর মনোভূমিতে একটি স্পষ্ট ছাপ রাখবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ করে ইতিহাসকে জীবনমুখী করতে গিয়ে করণীয় কাজের অবতারণা করেছি।

ইতিহাসের নতুন পাঠ্যক্রমের অবয়ব সৃষ্টিতে এ পুস্তকখানি রচনায় কতখানি সফল হয়েছি তার স্বীকৃতি পেলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৮শে জানুয়ারী
১৯৮১

হীরেন দে

সূচীপত্র

প্রচ্ছদলিপি পরিচয় : সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর

মানব সভ্যতার ইতিহাস

(মধ্যযুগ)

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের রূপরেখা

মধ্যযুগে মানব সভ্যতার বৈচিত্রময় ইতিহাস আলোচনা করবার আগে, এ যুগটিকে 'মধ্য' বলা হয় কেন সে কথাটি বুঝে নেওয়া দরকার।

মধ্যযুগ বলতে সভ্যতার কাল-এর এমন একটি পর্যায় বা স্তর বোঝায় যা প্রাচীনও নয় আবার আধুনিকও নয়। আমরা এই দুই এর মাঝখানের কাল বা যুগটিকে মধ্যযুগ বলতে পারি।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মধ্যযুগের আরম্ভ ও অবসান হয়েছে। **ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকটিকে পণ্ডিতগণ মধ্যযুগের শুরু এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশটিকে ঐ যুগেরই** শেষ বলে ধরে নিয়েছেন। এই ধরে নেওয়ার পেছনে কোন খেয়াল-খুশীর কারণ নেই। কতকগুলি অবস্থা—যেমন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম, ভাষা, আইন, শিল্পকলা প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে যে নতুন নতুন অবস্থা দেখা দেয় তা থেকে মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আসে নতুনত্ব। তখনই হয় একটি নতুন যুগের আরম্ভ এবং ক্রমে ক্রমে পুরনো যুগের অবসান। ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকটি ছিল এরূপ।

পণ্ডিতগণের মতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ (রোমের পতন) থেকে ১৪৫৩ খৃঃ (কনস্টান্টিনোপলের পতন) পর্যন্ত যে প্রায় এক হাজার বছর, সেই কাল বা যুগই হল মধ্যযুগ।

কোন যুগের শুরুতে বা শেষে যে সন্ধিক্ষণ আমরা সন তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করি, তা যে ঠিক্ ঠিক্ সময়ে শুরু বা শেষ হবে এমন কথা নয়। কারণ ইতিহাসের ঘটনায় থাকে যোগ-সূত্র, আগের ঘটনার রেশ

থাকে পরের ঘটনায়। তবু বোঝার দিক থেকে সুবিধে বলে কোন যুগান্তকারী ঘটনা ঘটার বছরকে কোন যুগের শুরু বা শেষ বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোন যুগের ঘটনাবলী যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের থাকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। যুগ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দিয়েই যুগের পরিচয়। ইউরোপে মধ্যযুগের এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রীতদাস প্রথার বদলে ভূমি-দাস প্রথার উদ্ভব হয়। ক্রীতদাসদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অপেক্ষা জমির সঙ্গে বেঁধে রাখা ভূমিদাসদের উৎপাদনে ভাগ বসানো অধিকতর সুবিধা থেকে এই প্রথার প্রচলন হয়। পুরনো চরিত্র নতুন চরিত্রে বিলীন হল। ফলে সমাজে শুরু হয় পুনর্গঠন।

প্রাচীন নানা দেব-দেবীর পূজা-পার্বনের বদলে **খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ফলে** একই ধর্মবোধে জনগণ বাঁধা পড়ে। খৃষ্টান পুরোহিতদের প্রধান পোপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। আবার পবিত্র রোম সাম্রাজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজা ও পোপের মধ্যে কে বড়, এই প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

এসময় **ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের ছোঁয়া লাগে ইউরোপে।** এ যেন রূপকথার এক সোনার কাঠি। ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। আর্থিক ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভরশীল রাজা ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা কমতে থাকে। **উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের বুদ্ধির জোরে ও অর্থের দাপটে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।** ফলে পুরাতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে এক নতুন ব্যবস্থা তৈরি হতে থাকে।

শিক্ষার বাহনরূপে প্রাচীন দেবভাষা ল্যাটিনের বদলে আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাটির পৃথিবীর উপর

মানুষের দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির চর্চা থেকে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। ফাটল ধরে জমাট বাঁধা সামন্ত সমাজে। **এর ভগ্নস্তুপের উপরেই গড়ে ওঠে নতুন যুগের বনিয়াদ।**

ইউরোপের মত ভারতেও মধ্যযুগ প্রায় একই সময়ে শুরু হয়। **সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজের পতনের শুরু থেকে এই যুগের সূচনা। যদিও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই সমাজ পরিবর্তনের ধারায় জোয়ার** আসে। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজের ভাঙ্গন ও ইংরেজদের আগমন থেকে ভারতের সমাজ পদ্ধতির বিকাশ ও বিবর্তনে নানা পরিবর্তন ঘটে। তাই **খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীকে মধ্যযুগের শেষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।**

ভারতেও মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল ইউরোপের মত সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা। প্রভাবশালী রাজ-পুরুষদের বেতনের বদলে রাজা বা সুলতানরা দিতেন জমিতে স্বত্ব। তাছাড়া মন্দির বা বৌদ্ধবিহারগুলির তদারকীতে যে বিশাল ভূমিখণ্ড থাকত সেখানে জমির উৎপাদনে বাঁধা থাকত ভূমিদাসরা। এ যুগে ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামীও কম ছিল না। আচার-বিচার ও কুসংস্কারে মানুষের জীবন ছিল শৃঙ্খলিত।

সামন্ত সমাজের সাধারণ চরিত্র নানা দেশে প্রায় এক হলেও যুগ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মধ্যযুগে ভারতে বাস্তব অবস্থা ইউরোপের মত একই ধরনের ছিল না।

ভারতে মধ্যযুগের ঠিক্ ঠিক্ শুরু যেখানে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী, ইউরোপের ক্ষেত্রে সেখানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। প্রকৃতির দিক থেকে ইউরোপে দাসত্ব প্রথা যতটা তীব্র ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। ভারতে সামন্ত ব্যবস্থা ইউরোপের মত সংগঠিত এবং স্তরে স্তরে সাজানো ছিল না। তা ছাড়া নাগরিক জীবন ও ধর্ম জীবন সেখানে এক সূত্রে বাঁধা ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি নয়। তাই

মধ্যযুগে ইউরোপ ও ভারতে এমনকি সব দেশে সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক সর্তগুলি এক হলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেশে হয় ঘটনার সময়ভেদ। অর্থাৎ একই রকম ঘটনা সব দেশে একই সময়ে ঘটে না। ফলে ঘটনার বিকাশে যেমন থাকে তারতম্য, প্রকৃতিতেও দেখা দেয় কমবেশী তীব্রতা। **ইতিহাসের 'অসমবিকাশ' কথাটির তাৎপর্য এখানে নিহিত।**

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সময়কে আমরা সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ করে থাকি—প্রাচীন' মধ্য ও আধুনিক।

২। মধ্যযুগ হল অতীত ও বর্তমান এই দুই-এর মাঝখানের যুগ। ইউরোপে এই যুগটি হচ্ছে রোমের পতন (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) থেকে কনস্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত।

৩। কোনো যুগের উদ্ভব হয় তার আগের যুগের গর্ভ থেকে। তাই কোনো যুগ শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ থাকে পরের যুগেও। সুতরাং তারিখ দিয়ে ঠিক্ ঠিক যুগ বিভাগ হয় না। তবু সুবিধার জন্য এটা করে নিতে'হয়।

৪। প্রাচীন যুগের পর যখন থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুনত্ব এল তখন থেকেই সূচনা হয় মধ্যযুগের।

৫। বিভিন্ন অবস্থার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের যেমন শুরু হয়, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে ঠিক তেমনি শেষও হয়।

৬। আমাদের দেশে মধ্যযুগের শুরু হয় ইউরোপ থেকে পরে। ইউরোপে যেখানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে মধ্যযুগের শুরু, আমাদের দেশে অষ্টম শতাব্দী। ইউরোপে যেমন মধ্যযুগের শেষ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ভারতের ক্ষেত্রে তা, অষ্টাদশ শতাব্দী।

৭। সামন্ত সমাজের রীতি পৃথিবীর সব দেশে প্রায় এক হলেও ইউরোপের তুলনায় মধ্যযুগের কতকগুলি লক্ষণের বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতে তারতম্য ছিল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঘটনার সময় ভেদ হয়। ফলে ঘটনার সাধারণ চরিত্র এক হলেও তারতম্য ঘটে বিকাশ ও প্রকৃতিতে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ—

(ক) ইউরোপে মধ্যযুগ কখন থেকে শুরু হয় ?

(খ) মধ্যযুগে ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথার বদলে কোন প্রথার উদ্ভব হয় ?

(গ) খ্রীষ্টান পুরোহিতদের প্রধানকে কি বলা হত ?

(ঘ) মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে কখন থেকে রাজশক্তি বৃদ্ধি পায় ?

(ঙ) ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে কি হয়েছিল ?

(চ) ভারতে কখন মধ্যযুগ শুরু হয় ?

(ছ) ভারতে মধ্যযুগের শেষরূপে কোন্ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

আত্মসমীক্ষা

অধ্যায়টি পাঠ করে তুমি কতটা বুঝেছ, তা জানবার জন্য নীচের **প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—**

১। ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকটিকে মধ্যযুগের শুরু বলে ধরে নেওয়া হয় কেন ?

২। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশটিকে ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ বলেই-বা ধরে নেওয়া হয় কেন ?

৩। ক্রীতদাস প্রথার বদলে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন হল কেন ?

৪। খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দী থেকে ভারতে মধ্যযুগের শুরু—একথা বলা হয় কেন ?

৫। ভারতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীকে মধ্যযুগের শেষ বলে ধরা হয় কেন ?

পূর্ণাঙ্গ উত্তর দাও ঃ—

ইতিহাসের 'অসম বিকাশ' কথাটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

করণীয় কাজ ঃ—

এই অধ্যায়টি পাঠ করে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের যে, যে লক্ষণগুলির তারতম্য তোমার মনে হচ্ছে সেগুলি বাড়ীতে লিখে বিদ্যালয়ের দিদিমণি বা মাষ্টার মশাইকে দেখিয়ে কতটা ঠিক হয়েছে তা, জেনে নেবে।

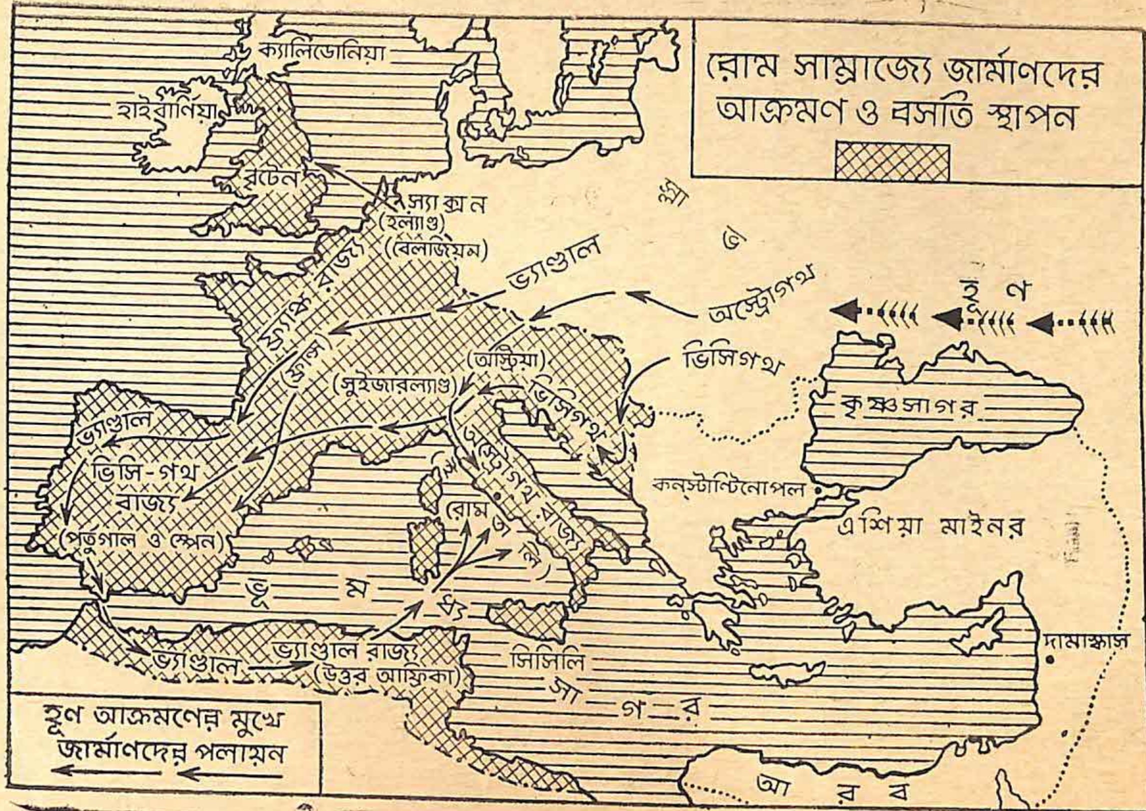
দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপ

রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা : প্রাচীন কালে ইটালীর রোম নগরীকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রোমের অধিবাসী রোমানরা ছিল বীর ও কুশলী। তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। 'সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। ফলে ধনে-জনে, শিল্প কলায় রোমের গৌরবের তখন শেষ নাই।

রোমের এই অতুলনীয় গৌরব ও পরাক্রম কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল। সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন, সম্রাটদের অযোগ্যতা, সামরিক শক্তির দুর্বলতা, সামাজিক ক্ষেত্রে দাস ও অভিজাত শ্রেণীর বৈষম্য প্রভৃতি কারনে রোম সাম্রাজ্যকে ভেতরে ভেতরে দুর্বল করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের ভেতর যখন এই অবস্থা তখনই সীমান্ত ভেদ করে হানা দিল কয়েকটি জার্মান উপজাতি গোষ্ঠি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, স্যাক্সন, এ্যাঙ্গেলস্, গথ প্রভৃতি উপজাতি। গথদের আবার দুটি ভাগ ছিল—ভিসিগথ (পশ্চিম দিকের গথ) এবং অস্ট্রোগথ (পূর্ব দিকের গথ)।

হুণ আক্রমণ—জার্মানদের রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হুণ জাতির আক্রমণ। হুণরা জাতিতে ছিল মঙ্গোলীয়। এরা স্বভাবে ছিল যাযাবর ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। এই যাযাবর উপজাতি মধ্য এসিয়া থেকে অগ্রসর হয় ইউরোপের দিকে চারণভূমির সন্ধানে। এদের আক্রমণের ফলে অষ্ট্রোগথ ও ভিসিগথরা রোম সম্রাটের নিকট সাম্রাজ্যের ভিতরে বসবাসের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। সাম্রাজ্যের সীমান্তগুলি পাহারা দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁরা সম্রাট ভ্যালেন্স-এর কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে।

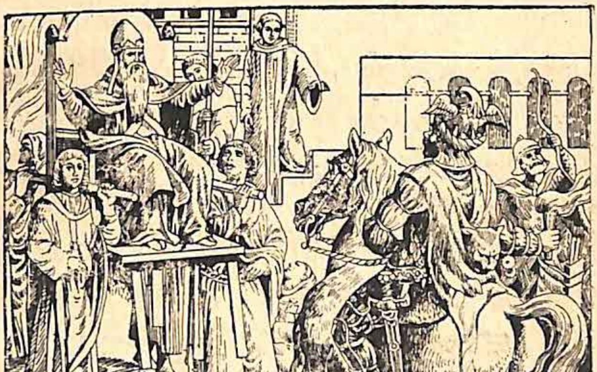

রোম সাম্রাজ্যে জার্মাণদের আক্রমণ ও বসতি স্থাপন
হূণ আক্রমণের মুখে জার্মাণদের পলায়ন
ক্যালিডোনিয়া
হাইবার্ণিয়া
বৃটেন
স্যাক্সন
(হল্যাণ্ড)
(বেলজিয়ম)
ফ্র্যাঙ্ক রাজ্য
(ফ্রান্স)
ভ্যাণ্ডাল
অস্ট্রোগথ
ভিসিগথ
হূ ণ
(অস্ট্রিয়া)
(সুইজারল্যাণ্ড)
ভিসি-গথ রাজ্য
(পর্তুগাল ও স্পেন)
অস্ট্রোগথ রাজ্য
রোম
ভ্যাণ্ডাল রাজ্য
(উত্তর আফ্রিকা)
সিসিলি
ভূ ম ধ্য সা গ র
কৃষ্ণসাগর
কনস্টাণ্টিনোপল
এশিয়া মাইনর
দামাস্কাস
আ র ব

পরে তাঁরা সাম্রাজ্যের সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার অনুমতি পায়। কিন্তু শীঘ্রই রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে তারা বিদ্রোহ করে। ফলে রোমের সঙ্গে এদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোমানরা এদের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে এরা আবার রোম আক্রমণ করে এবং ৪১০ খৃষ্টাব্দে রোম দখল করে লুণ্ঠন চালায়। পরবর্তী পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে রোম সাম্রাজ্যের উপর বর্বর জাতিগুলি প্রায় অবিরাম ভাবে আক্রমণ চালাতে থাকে। প্রায় একই সময়ে ভ্যাণ্ডাল জাতি উত্তর আফ্রিকার প্রদেশগুলি দখল করে নেয়। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে এরা ইতালি অধিকার করে রোম ধূলিসাৎ করে। এঙ্গলস্-স্যাক্সন ও জুটরা বৃটেন আক্রমণ করে। এদিকে হুণ জাতি বল্‌কান উপদ্বীপ ছারখার করে উত্তর ইতালিতে আঘাত হানে। রোম সাম্রাজ্য আগেই দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বাইজ্যান্টিয়াম নামে পরিচিত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ছিল ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। অবশেষে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্বর সৈন্যবাহিনীর হাতে শেষ রোম সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাস নিহত হন। ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হল। শুরু হল ইউরোপের মধ্যযুগ।

রোমক আইন ও সংহতি :—রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও, সাম্রাজ্যের স্মৃতি মানুষের মনে স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধতা, সুষ্ঠু আইন শৃংখলা, জন সাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচুর্য প্রভৃতি মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে আগেকার সাম্রাজ্য ফিরে আসুক এমন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল কারণ, তাদের কাছে রোম সাম্রাজ্যের অর্থই ঐক্য, আইন-শৃংখলা ও প্রাচুর্য। সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় সেজন্য জনপ্রিয় রোমান আইন কানুনগুলি টিঁকে রইল। এমনকি বিজয়ী নতুন শাসকরাও রোমান আদর্শগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন।

অ্যালারিক—গথদের নেতা ছিলেন অ্যালারিক। ৪০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম নগরী অবরোধ করেন। শীঘ্রই খাদ্যাভাব থেকে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে অসংখ্য নরনারীর মৃত্যু হয়। রোমের সেনেট অবশেষে অ্যালারিকের সঙ্গে আপোষ মিমাংসার জন্য আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে অ্যালারিকের দাবী পূরণ করা হয়। রোম অবরোধ মুক্ত হল।

কিন্তু ৪১০ খৃঃ অ্যালারিক আবার রোম আক্রমণ করলেন। এবারেও তাঁকে বাধা দেবার মত শক্তি রোমের ছিল না। সম্রাট



জার্মান আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যালীলা

হনোরিয়াস রাভেনাতে পালিয়ে গেলেন। অ্যালারিক সসৈন্যে রোম নগরীতে প্রবেশ করলেন। অ্যালারিকের সৈন্যদল: রোমে বাধা না পেয়ে লুণ্ঠন চালিয়ে প্রচুর ধনরত্নসহ হাজার হাজার নরনারীকে বন্দী

করে সিসিলির দিকে যাত্রা করে। যাবার পথে হঠাৎ অ্যালারিকের মৃত্যু হয় (৪১০ খৃঃ)।

অ্যাটিলা—হুনরা ছিল জাতিতে মাঙ্গোলীয়। মধ্য-এশিয়ায় এরা বাস করত। তারা ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। (শোনা যায় এদের আক্রমণের ফলেই গথ উপজাতি রোম সাম্রাজ্যের দিকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।) এই হুণ জাতির বিখ্যাত রাজা ছিলেন অ্যাটিলা। তাঁর রাজত্বকালে হুণ সাম্রাজ্য মধ্য এসিয়া থেকে রোম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অ্যাটিলা ছিলেন বেঁটে ও দেখতে মোটেই ভাল নয়। তাঁর মাথা ছিল প্রকাণ্ড, চোখ ছোট ছোট, নাক চ্যাপ্টা। তাঁর দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ। স্বভাবে তিনি ছিলেন নৃশংস ও রক্তপিপাসু। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, গ্রাম, নগর ছারখার করে, হত্যা ও লুণ্ঠন করে সেকালের মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। নৃশংস এই হুণ সম্রাটকে তাই সে সময়কার লোকেরা বলত **'ভগবানের অভিশাপ'**।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাইন নদী পার হয়ে অ্যাটিলা গল (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন। রোমের সেনাপতি এটিয়াস ফ্রাঙ্ক, গথ ও বর্গাণ্ডির মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ৪৫১ খৃঃ ক্যালনস-এর যুদ্ধে বা জাতি সমুহের যুদ্ধে অ্যাটিলাকে পরাজিত করেন। পরাজয়ের পর অ্যাটিলা রাইন নদী পর্যন্ত সরে গেলেন। কিন্তু পরের বছর তিনি আবার উত্তর ইতালি আক্রমণ করেন। ইচ্ছা করলেই তিনি রোম লুণ্ঠন করতে পারতেন। কিন্তু পোপের অনুরোধে রোমে প্রবেশ না করে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। এর পর ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর হুণসাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

জেসেরিক—ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিলেন জেসেরিক। তিনি ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে রোম আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে হুন বিজয়ী রোমের সেনাপতি এটিয়াসের মৃত্যু হয়। ফলে জেসেরিক সহজেই রোম দখল করেন এবং অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে নগরীকে শ্মশানে পরিণত করেন।

জার্মান উপজাতিদের জীবনযাত্রা

রোমানদের প্রসিদ্ধ বীর জুলিয়াস সিজার ও ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের লেখা থেকে জার্মানদের সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক জার্মান উপজাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। এদের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল—অভিজাত, স্বাধীন নরনারী ও ভূমিদাস। এরা বিশাল প্রান্তরের মধ্যে গ্রাম পত্তন করে বসবাস করত। গ্রামগুলি সাধারণতঃ ঘেরা থাকত বড় বড় কাঠের বেড়ার সাহায্যে। কাদা ও কাঠ দিয়ে তারা বাড়ী তৈরী করত। শিকার, পশুপালন ও মাছ ধরা ছাড়াও এরা কিছু কিছু চাষ-আবাদ করত। জার্মান উপজাতিগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত যুদ্ধ প্রিয় ও স্বাধীনচেতা ছিল। এদের অস্ত্র ছিল বর্শা, তীর-ধনুক, ঢাল ও তলোয়ার। জার্মান মেয়েরাও ছিল সাহসী ও নির্ভীক।

রোমের পতনের পর বিভিন্ন জার্মান উপজাতি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে নেয়। এঙ্গলস্ ও স্যাকসনরা বৃটেন অধিকার করে। ফ্রাঙ্করা অধিকার করে উত্তর গল (ফ্রান্স), ভিসিগথরা স্পেন, ভাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্য সাগরের দ্বীপসমূহ এবং অষ্ট্রোগথরা ইটালীতে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। পঞ্চাশ বছরের উপর ধরে এই নতুন রাজ্য স্থাপনের অভিযান চলে।

জার্মানরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পর ধীরে ধীরে রোমান জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। ক্রমশঃ তারা নিজেদের ভাষার পরিবর্তে রোমের ভাষা অর্থাৎ ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ব করে। রোমান ও জার্মানদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক ও স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁরা খৃষ্টান ধর্ম ও গ্রহণ করে। ধর্মের পালনীয় বিধি তাদের জীবন ধারায় শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে আসে। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতি আনুগত্য বা ধর্মীয় বন্ধন রোমান ও জার্মান উপজাতিগুলির পারস্পরিক মিলনে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছিল। এদের সংমিশ্রনেই সৃষ্টি হয় বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতি সমূহ।

অনুশীলনী

বিশেষভাবে মনে রাখবে :—

১। রোম সাম্রাজের ভেতরের দুর্বলতা' হুণ ও বর্বরদের রোম আক্রমণের পথ সহজ করে তোলে।

২। প্রাচীন গ্রীকরা যাদের ভাষা বুঝত না তাদেরই বলত বর্বর। আসলে বর্বর বলতে বিভিন্ন জার্মান উপজাতিদের বোঝায়। এরা কিন্তু একেবারে অসভ্য ছিল না।

৩। অবিরাম আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল তাঁদের দখলে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের পতন ঘটে।

৪। জার্মানরা ছিল কষ্ট সহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা। খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যে নীতিবোধ দেখা দেয় তা থেকে আসে শৃঙ্খলা। ক্রমে রোমানদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি গ্রহণ করে তাঁরা রোমানদের কুলে মিশে যায়।

৫। রোমের পতন হলেও সাম্রাজের গৌরবময় দিনগুলিতে সুখ, শান্তির স্মৃতিগুলো মানুষের মনে এক স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল।

৬। নতুন রাজ্যগুলির বিজয়ী শাসকেরাও রোম সাম্রাজ্যের আদর্শ পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়।

৭। জার্মান উপজাতিগুলির নেতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন এ্যালারিক জেসেরিক প্রভৃতি।

নীচের ঘটনাগুলি সময়ানুক্রমে সাজাও

(ক) গথনেতা অ্যালারিকের রোম লুণ্ঠন ; (খ) ভাণ্ডাল নেতা জেসেরিকের রোম আক্রমন ; (গ) হুণ নেতা অ্যাটিলার মৃত্যু ; (ঘ) অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ ; (ঙ) রোম সাম্রাজ্যের পতন ; (চ) ক্যালনস বা জাতিসমূহের যুদ্ধে অ্যাটিলার পরাজয় ;

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর থেকে রোম সাম্রাজ্য ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল কেন ?

(খ) জার্মান উপজাতি কাদের বলা হত ?

(গ) হুণরা কোথা থেকে ইউরোপের দিকে এগিয়ে যায় ?

(ঘ) তাদের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে কি কারণ ছিল ?

(ঙ) রোম সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে কারা বসবাসের অনুমতি পায় ?

(চ) কোন সর্তে তাঁরা বসবাসের অনুমতি পায় ?

আত্ম সমীক্ষা

শূন্যস্থান পূরণ কর :

গথদের মধ্যে — ভাগ ছিল। একটি — অপরটি —।

আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ হয় — খ্রীষ্টাব্দে। শেষ রোম সম্রাটের নাম ছিল —।

গথদের নেতা ছিলেন —। হূণদের নেতা ছিলেন —।

রোমান ঐতিহাসিকের নাম ছিল —।

অ্যাঙ্গলস ও স্যাক্সনরা অধিকার করে — ফ্রাঙ্করা — ভিসিগথরা —

অষ্ট্রোগথ — এবং ভাণ্ডালরা — অধিকার করে।

সত্য কিম্বা মিথ্যা লিখ :

(ক) আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোমান বাহিনী জয় লাভ করে।

(খ) ৪১০ খৃষ্টাব্দে গথনেতা অ্যালারিক রোম আক্রমণ করলে সম্রাট হনোরিয়াস গথদের প্রতিহত করেন।

(গ) হূনরা ছিল দক্ষিন এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ জাতি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

১। রোম সাম্রাজ্যের অবনতির কারণগুলি বুঝিয়ে বল।

২। কাকে 'বিধাতার অভিশাপ' বলা হত এবং কেন ?

৩। রোম সাম্রাজ্যের স্মৃতি কেন মানুষেরা ভুলতে পারে নি ?

৪। জার্মান উপজাতিরা কি ভাবে রোমানদের সঙ্গে মিশে গেল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। জার্মান উপজাতিগুলির চরিত্র ও জীবন যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

করণীয় কাজ :

ইউরোপের সীমারেখা এঁকে জার্মান উপজাতিদের আদিবাস দেখাও। একই সঙ্গে তাদের ও হূণদের অভিযানের পথ তীর চিহ্নিত কর।

২

তৃতীয় অধ্যায়

'অন্ধকারময় যুগ'—মন্তব্যের সত্যাসত্য

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের ইউরোপ—তোমরা আগেই জেনেছ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর থেকেই রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। এই দুর্বল অন্তঃসারশূন্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে হানা দেয় উত্তরে ইউরোপের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী। এই সময়ে হুণনেতা অ্যাটিলার দুর্ধর্ষ বাহিনীও ঢুকে পড়ে ঝড়ের মত। বহুদিন ধরে ক্রমাগত আক্রমণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসলীলার ফলে অবশেষে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমসাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে তাসের ঘরের মত। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার ফলে জনজীবন হয়ে পড়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চার ক্ষেত্রে নেমে আসে প্রায় অন্ধকার। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এভাবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে যে অরাজক অবস্থা চলতে থাকে তা থেকেই অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার চারিদিক প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। এরূপ অবস্থা খৃষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক এই দীর্ঘ সময়টিকে **'অন্ধকারময় যুগ'** নামে অভিহিত করেছেন।

তা বলে, রোমের পতনের পর কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপে শুধু যে অরাজকতাই চলছিল এবং জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়েছিল তা বলা ঠিক নয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে অবশ্য ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এ সময়ে ইউরোপ এমন এক যুগে প্রবেশ করে যাকে 'অন্ধকারময় যুগ' বলে মনে হতে পারে। অনবরত যুদ্ধের ফলে যে অশান্ত পরিবেশ দেখা দিয়েছিল, তাতে জ্ঞান বিদ্যা চর্চার অত্যন্ত অবনতি ঘটে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু **অন্ধকার যুগের সবটাই অন্ধকারময় ছিল না।**

শিক্ষা-দীক্ষার চর্চার কেন্দ্ররূপে মঠগীর্জা গুলির ভুমিকা :—

রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিস্ময়করভাবে অক্ষত থেকে গিয়েছিল খৃষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠান। রোমান ও পরে বর্বর জাতিগুলির অনেকেই ধর্মের দিক থেকে ছিল খৃষ্টান। একই ধর্ম প্রতিষ্ঠান রোমান ক্যাথলিক গীর্জা তাদের মধ্যে একতা রক্ষা করতে পেরেছিল। সাধারণ বিদ্যালয়গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও গীর্জা দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় বিদ্যালয় গুলিতে বিদ্যা-চর্চা অব্যাহত ছিল। এগুলিতে আগের মতই ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার অনুশীলন চলতে থাকে। রোমের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করল এসব খৃষ্টীয় মঠগীর্জা।

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। তাদের প্রচেষ্টায় নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল মঠ। গীর্জার প্রতি আনুগত্য এবং পবিত্রতার ব্রত নিয়ে খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা শিক্ষার ধারাটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। খৃষ্টান সাধু-সন্তদের জীবনী, ইতিহাস ও ঘটনাপঞ্জী প্রভৃতি যা কিছু উল্লেখ করার মত রচনা, সেগুলি তাদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে পোপ **মহান গ্রেগরীর** (৫৯০-৬০৪) অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনি সাতটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

গথ ও রোমানদের রাজা থিওডরিকের উৎসাহে এ সময়ে কিছুটা জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। তার এক সভাসদ ক্যাসিওডোরাসের অক্লান্ত চেষ্টায় শিক্ষার দীপশিখা ইউরোপের অন্ততঃ খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রাখে। তিনি দক্ষিণ ইটালীতে কয়েকটি মঠ, গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি ক্রমে বিদ্যাচর্চার বড় বেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের বহু মূল্যবান লিখিত বিষয় তিনি বর্বর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর রচিত বিশ্বকোষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর এক ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক ছিলেন ফ্রাঙ্কদের ঐতিহাসিক **গ্রেগরী** (৫৩৮-৫৯৪ খৃঃ)। তিনি বর্ণনা শক্তিতে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যেজন্য তাঁকে 'বর্বরদের হেরোডোটাস' বলা হত।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আরও একজন খৃষ্টান **সেন্ট বেনিডিক্ট** ও তাঁর সম্প্রদায় অনেক মঠ, গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

ন্যায়-অন্যায়-বোধ সম্বন্ধে ধর্মীয় ধারণার প্রভাব—মঠ-গীর্জাগুলি সাহিত্য লেখা, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ও জ্ঞানবিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্ররূপেই শুধু মাত্র গড়ে ওঠেনি। নীতিবোধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের আশ্বাসও মানুষ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পেরেছে। মরুভূমির মরুদ্যানের মতই এসব প্রতিষ্ঠান দিয়েছে দিশাহারা জনজীবনে সুশীতল ছায়া। এভাবে সভ্যতা সংস্কৃতির উপাদানগুলি মঠ গীর্জায় লালিত হয়ে সমাজের প্রয়োজন অন্ততঃ খানিকটা মিটিয়েছে।

এখান থেকেই মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মায় স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে মৃত্যুর পর মানুষের স্বর্গীয় সুখ বা নরক-যন্ত্রণা যখন এ জীবনে কাজের মাধ্যমেই নির্দ্ধারিত হয়, এমন বিশ্বাস থেকেই সে যুগে মানুষের মনে ভাল কাজ করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া কোন দুর্বল রাজার সময় যখননিয়মশৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছে তখন গীর্জার পুরোহিতরাই সে অভাব খানিকটা পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছে। জনজীবনে নানা ধরনের চুক্তি রক্ষায় যেমন—মৃতের ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে, বিবাহ দায়িত্ব পালন করতে, বিধবা ও মাতৃপিতৃহীন শিশুদের রক্ষা করতে এদের সেবাকার্য অশান্ত সমাজে দিয়েছে খানিকটা শান্তির সন্ধান। শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক চর্চার অভাবে সে যুগে জ্ঞানের আলো যে নিভু নিভু অবস্থায় এসেছিল, তা কিন্তু এদেরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একেবারে নিভে যায়নি। স্তিমিত হলেও সে আলো ছিল অনির্বাণ।

একথা ঠিক যে, রোমান যুগের গৌরবময় অধ্যায়ের তুলনায় এ সময়ে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ছিল নিতান্ত সামান্য। তবু প্রায় অন্ধকার অবস্থার মধ্যে এগুলিই ছিল আলোর শিখা। এসময়ের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষীণ ধারাই ৯ম শতাব্দীর নবজাগরণে (কেরালিঞ্জিয়ান রেনেসাঁ) রূপ লাভ করে। (এবিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরও জানতে পারবে)

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। রোম সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক পতনের আগেই যে অরাজক অবস্থা দেখা দিয়েছিল, পতনের পর তা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

২। ফলে খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে নেমে আসে প্রায় অন্ধকার। কোন কোন ঐতিহাসিক এ সময়টিকে 'অন্ধকারময় যুগ' রূপে চিহ্নিত করেছেন।

৩। জনজীবনের নানা দিকে অবস্থার অবনতি হলেও, জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।

৪। খৃষ্টানধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুরোহিত ও পণ্ডিতদের অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যা-চর্চা প্রায় অব্যাহত থাকে। ফলে জ্ঞানের আলো থাকে অনির্বাণ। এ বিষয়ে মহান পোপ গ্রেগরী, রাজা থিয়োডোরিক, ক্যাসিওডোরাস, ঐতিহাসিক গ্রেগরী, সেন্ট বেনিডিক্ট, পণ্ডিতবিড্, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। এছাড়া খৃষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জীবনে ন্যায়-অন্যায়-বোধ সম্বন্ধে ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টি করে সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৬। সুতরাং এ সময়ে জ্ঞানবিদ্যার চর্চার ক্ষেত্র সীমিত হলেও অর্থাৎ রোমের গৌরবময় দিনগুলির মত না হলেও, জ্ঞানের আলো কিন্তু একেবারে নিভে যায় নি। তাই ইহাকে 'অন্ধকারময় যুগ' রূপে অভিহিত করা পুরোপুরি ঠিক নয়।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) রোমের পতনের ফলে মানুষের জীবনের কোন্ কোন্ দিকে ভীষণ ক্ষতি হল?

(খ) পশ্চিম ইউরোপে কোন্ সময়টিকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?

(গ) সে সময়ে বিদ্যা-চর্চা কোথায় অব্যাহত থাকে?

(ঘ) মঠ, গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন এমন কয়েকজন স্মরণীয় ব্যক্তির নাম কর।

(ঙ) মঠ, গীর্জাগুলি সে যুগে সভ্যতার অগ্রগতিতে কিভাবে সাহায্য করেছে?

পূর্ণাঙ্গ উত্তর দাও :—

যে সব যুক্তিতে, পঃ ইউরোপে খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়টিকে তুমি সম্পূর্ণ 'অন্ধকারময় যুগ' বলে মনে কর, কিম্বা কর না, তা আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজান্টাইন সভ্যতা

কনস্টানটাইন :—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিকে সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান-এর মৃত্যুর পর রোমের সম্রাট হলেন কনস্টানটাইন। তিনি ৩০৬ থেকে ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্বাঞ্চলের সম্রাট লিসিনিয়াসকে পরাজিত করে তিনি সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের একক আধিপত্য লাভ করেন।

কনস্টান্টিনোপল-এর প্রতিষ্ঠা :—সম্রাট কনস্টানটাইন ছিলেন বিচক্ষণ শাসক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর রাজত্ব কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রোম থেকে রাজধানী পরিবর্তন করে প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামে—নতুন রাজধানী রূপে কনস্টানটিনোপলের প্রতিষ্ঠা।

নতুন রাজধানী স্থাপনের কারণ :—রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত ছিল। মিশর ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের ব্যবসা বানিজ্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করায় পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বাইজান্টিয়ামে রাজধানী পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

রোম-এর চাইতে বাইজান্টিয়াম থেকে জার্মান উপজাতি গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিরোধ ও সীমান্ত রক্ষা করা অধিকতর সুবিধাপূর্ণ ছিল। তা ছাড়া, রোমের অধিবাসীদের অনেকেই ছিল রক্ষণশীল ও নতুনত্বের বিরোধী। এমনকি সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনে কোন গৃহীত সংস্কার কার্য তাঁরা অনেক সময় সুনজরে দেখতেন না। এসব কারণে কনস্টানটাইন রাজধানী সরিয়ে আনলেন পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামে।

কৃষ্ণসাগরের তীরে আগেকার গ্রীক শহর বাইজান্টিয়াম সম্প্রসারিত ও পুনঃনির্মিত হল। সম্রাটের নামে নতুন রাজধানীর নাম হল কনস্টানটিনোপল। সাতটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল এই সাম্রাজ্যের রমণীয় রাজধানী। নগরটির একদিকে পাহাড় ও অপর দিকে সমুদ্র, শত্রুআক্রমণ প্রতিরোধে তুর্ভেদ্য ছিল।

রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে খ্রীষ্টান ধর্ম :—কনস্টানটাইনের রাজত্ব কালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল খৃষ্টান ধর্মের রাষ্ট্রীয় বা সরকরী ধর্ম রূপে স্বীকৃতি লাভ। রোমানদের প্রাচীন ধর্মে অসংখ্য দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় জীবনে মেনে চলতে হত। ফলে ধর্মীয় জীবনে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষ এই জটিলতা থেকে মুক্তির সহজ পথের সন্ধান করে ; এই সহজপথের সন্ধান দিল খৃষ্টান ধর্ম।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সরল জীবন যাত্রা ও মৃত্যুর পর পরলোকে বিশ্বাস—এই তুটি আদর্শ রোমের লোকেদের মন জয় করে।

প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের দরিদ্র মানুষরা, যেমন—কৃষক, স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাসরা দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সম্রাটদের এই ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সম্রাটরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নানাভাবে নির্যাতন ও শাস্তিদান করতে লাগলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্যের উপরতলার মানুষরাও ক্রমশঃ এই ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

সম্রাট কনস্টানটাইন নির্যাতন অপেক্ষা সাম্রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এই ধর্মের সনর্থন ও সহযোগিতা লাভ করার দিকে মন দিলেন। ফলে খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টানদের সুগঠিত গীর্জার সঙ্গে রাষ্ট্রের বিভেদ কমে এল। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে মিলান শহর থেকে তিনি একটি রাজ আদেশ প্রচারিত করেন। এই আদেশের বলে খৃষ্টানদের ধর্মীয় কার্য-কলাপের উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়। খৃষ্টান ধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। ফলে

কনস্টানটাইনের রাজত্বকালে খৃষ্টান গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন গড়ে ওঠে।

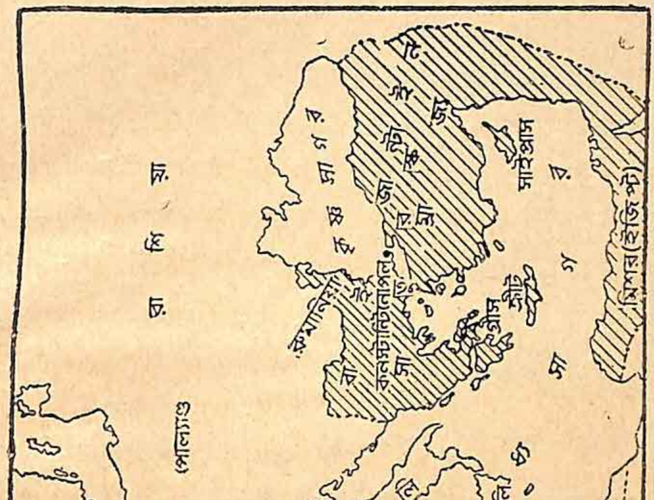
সম্রাট উদার হস্তে খৃষ্টান গীর্জাকে অর্থ ও ভূমি দান করে সম্পদশালী করে তোলেন। তাঁর এই সহনশীলতা ও মহানুভবতার জন্য খৃষ্টান গীর্জা তাঁকে **'মহান'** উপাধীতে ভূষিত করেন। কনস্টান-টাইনের সময় থেকেই খৃষ্টান গীর্জা রাজশক্তির এক বিশ্বস্ত মিত্র ও সমর্থকে পরিণত হয়।

সম্রাট কনস্টানটাইনের রাজত্বকালে রোমসাম্রাজ্য অবিভক্ত থাকে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সম্রাটগণ ছিলেন তুর্বল। সেসময়ে জার্মানদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য রোম সাম্রাজ্য আবার পূর্ব ও পশ্চিম এই তু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তু'অংশের মধ্যে বিচ্ছেদ হল চূড়ান্ত। তখন থেকে রোম হল পশ্চিমদিকের অর্দ্ধেকটার রাজধানী। তুই দিকেই তুই সাম্রাজ্য শাসনের ভার পড়ে তু'জন করে সম্রাটের উপর। এ ভাবে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়।

গ্রীক আমলের বাইজান্টিয়াম শহরকে কেন্দ্র করে কনস্টান্টিনোপল নামে যে নতুন রাজধানী হল ; সেখানে বাস করত নানাজাতির লোক। তাঁদের মধ্যে গ্রীকরা ছিল প্রধান। প্রধান ভাষাও ছিল গ্রীক। তাই গ্রীক সভ্যতার প্রভাও পড়েছিল এখানে বেশী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে এখানে যে নতুন সভ্যতার সূচনা হয় পণ্ডিতগণ তাঁকে **বাইজান্টাইন সভ্যতা** নাম দিয়েছে। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে **এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগ সেতুর** কাজ করেছে।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও বাইজান্টাইন বা পূর্ব সাম্রাজ্য সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে পূর্বাঞ্চল সম্রাটদের আধিপত্য অটুট ছিল। এই সাম্রাজ্য এক হাজারেরও বেশী

সময় ধরে অব্যাহত থাকে (১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টি-নোপলের পতনের পূর্ব পর্যন্ত)। বাইজান্টাইন বা পূর্বসাম্রাজ্যের



[মানচিত্রে দুই দিকের দুই সাম্রাজ্য ও তাদের রাজধানী রোম ও কনস্টান্টিনোপল দেখে নাও।]

এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে, তিনি হলেন সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান। কনস্টানটাইনের মৃত্যুর প্রায় দু'শ বছর পরে ৫২৭ সনে ৪৫ বছর বয়সে সম্রাট হলেন জাস্টিনিয়ান।

জাস্টিনিয়ান ঃ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাটগণের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন জাস্টিনিয়ান। ম্যাসিডোনিয়ার এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। নিজের প্রতিভাবলে তিনি সম্রাট পদ লাভ করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক শক্তি—সব দিক থেকেই তাঁর রাজত্বকাল (৫২৭-৫৬৫ খৃঃ) অসাধারণ উন্নতি লাভ করে।



জাস্টিনিয়ান

দ্বিধা বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপন ঃ

জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পূর্ব ও পশ্চিমরোম সাম্রাজ্যের মধ্যে পুনরায় ঐক্যস্থাপন। সম্রাট পদ লাভ করার পর প্রথমে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনীতিও পুনর্গঠিত হয়। তিনি সেনা ও নৌবাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করেন। এর পর তিনি রোম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে হাত দেন। এ কাজের সাফল্যের পেছনে তার সেনাপাতি **বেলিসারিয়াসের** অবদান ছিল অসামান্য। প্রথমে তিনি ভাণ্ডালদের আক্রমণ করে অত্যন্ত অল্পসময়ে তাদের পরাজিত করেন। ভিসিগথরাও তার নিকট পরাজিত হয়। অষ্ট্রোগথরা দীর্ঘ আঠারো বছর যুদ্ধ করার ফলে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য সম্রাটের অধীনে আসে। শীঘ্রই সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তিনি রোম সাম্রজ্যের দুই অংশ একত্রিত করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের দুই অংশ আবার আলাদা হয়ে যায়।

জাস্টিনিয়ান-এর আইন সংস্কার : জাস্টিনিয়ানের খ্যাতি কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়ের জন্যেই নয়। আইন সংস্কারের জন্যও তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি পুরাতন বিধানগুলির সংস্কার করেন। সে সময়ে রোমে প্রচলিত আইনের সঙ্গে প্রদেশগুলিতে প্রচলিত আইনের মিল ছিল না। তিনি এই অসঙ্গতি দূর করে সর্বত্র একইপ্রকার আইন চালু করেন। এই সম্বন্ধে তার কাজ তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমে, তিনি আইনবিদ্‌দের উপর রোমান জাতির প্রচলিত সমস্ত আইন সংগ্রহ করার ভার দেন। এই আইনের সংকলন গ্রন্থই '**জাস্টিনিয়ানের কোড**' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ, তিনি আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আইনের বিষয় অনুসারে সাজিয়ে সংক্ষেপে একটি পৃথক গ্রন্থরচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম **'আইনের সংক্ষিপ্তসার'** তৃতীয়তঃ, আইনশাস্ত্র পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রদের সুবিধার জন্য রোমান আইনের মূল তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন। এর নাম **'সংহিতা'** এই তিনখানি গ্রন্থ একত্রে **জাস্টিনিয়ানের আইন'** নামে পরিচিত। 'জাস্টিনিয়ানের আইন' বর্তমান সভ্যজগতের আইন প্রণেতাদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে। তার আইন বিধির মূল নীতিগুলি পৃথিবীর বহুদেশে এখনও অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

জাস্টিনিয়ান স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার সময়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল-এর শোভা ও ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যায়। রাজধানী কনস্টানটিনোপলের রাজপ্রাসাদ, লাইব্রেরী, যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, থিয়েটার এবং নানাধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান উহার গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি করে। তিনি সেন্ট সোফিয়ার বিখ্যাত গীর্জা বা উপাসনা মন্দির নির্মাণ করেন। বাইজান্টিয়ামের একজন কবি এ গীর্জা সম্বন্ধে বলেছেন "স্বর্গের একটি টুকরো যেন ধরাতলে খসে পড়েছে।" গীর্জার ভেতরে যীশুখৃষ্টের জীবন কাহিনী, বাইবেলের কাহিনী ও খৃষ্টান সাধুদের চরিত্র চিত্রের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল নানা রং-বেরং-এর মসৃণ মার্বেল পাথর ও কাঁচ-খণ্ডের সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ

মোজাইক চিত্র। গীর্জার পাথরের জালিগুলিও বাইজান্টাইন শিল্পীদের অপূর্ব সৃষ্টি। তিন লক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ডের সোনা খরচ করে দশ হাজার কর্মীর ৫০ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গীর্জা তৈরী করা হয়েছিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন হলে, বিজয়ী



সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা

অটোম্যান তুর্কীরা এ অতুলনীয় গীর্জাটিকে মসজিদে পরিণত করে।

বাইজাণ্টাইনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি :

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটিনোপল আয়তনে, সৌন্দর্যে ও শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে, সমগ্র জগতের কাছে ছিল এক পরম বিস্ময়। বস্‌ফোরাস প্রণালীর উপর এই নগর কেবলমাত্র সম্রাটদের বাসস্থান ও রাজধানীই ছিল না, এটি ছিল একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ও কর্মচঞ্চল শিল্প নগরী। এখানকার অধিবাসীদের অনেকেই ছিল বণিক। চীন, ভারতবর্ষ, সিংহল, আরব মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ভারত ও

চীন থেকে পণ্য আমদানী করত লোহিত সাগরের পথে। ইরানীদের সাথে শত্রুতা থাকায়, স্থলপথের পরিবর্তে জলপথে কৃষ্ণ সাগরের তীর হয়ে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদান হত। এ ছাড়া ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সে সব দেশ থেকে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য যেমন এখানে আমদানী করা হত তেমনি সাম্রাজ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল এই নগরী। সুতরাং বাইজান্টাইন বণিকরা **তিনটি মহাদেশের** সঙ্গেই পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা করবার সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল।

গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার কেন্দ্র হিসেবেও বাইজান্টাইন ছিল প্রসিদ্ধ। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে **চারটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল**। গ্রীক দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র এখানে নিয়মিত চর্চা করা হত। রাজ-প্রাসাদের মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত এখানে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন। ধর্ম শাস্ত্র সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা সভা বসত এবং এগুলিতে সম্রাটগণ সভাপতিত্ব করতেন। বাইজান্টাইনে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সেখানে **জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা** ছিল। বাইজান্টিয়াম ছিল সাহিত্য ও দর্শনের মূল্যবান পুঁথির এক সংগ্রহশালা। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ এসব দুর্লভ পুঁথির আকর্ষণে সমবেত হতেন।

শিল্প সৌন্দর্যের দিক থেকেও বাইজান্টিয়াম প্রসিদ্ধ ছিল। কনস্টানটাইন-এর সময় থেকে এখানকার স্থাপত্য শোভার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও ভাস্করদের তিনি নগর নির্মাণে ও মূর্তি, স্তম্ভ প্রভৃতি তৈরী করতে নিয়োগ করেন। নগরের মধ্যস্থলে তৈরী হয়েছিল এক বিরাট সভামণ্ডপ। তার কেন্দ্র স্থলে ছিল ত্রিশ ফুট পরিধি বিশিষ্ট এক সু-উচ্চ স্তম্ভ। স্তম্ভের শীর্ষে ছিল, অ্যাপোলো (সূর্য) দেবের মূর্তি। এছাড়া খেলা-ধূলো দেখার জন্য গোলাকার

বসার স্থান (ষ্টেডিয়াম), উন্মুক্ত রঙ্গালয়, স্নানাগার ও অট্টালিকা ছিল। এসবই ছিল শিল্প কর্মের বিস্ময়কর নিদর্শন।

এখানকার খৃষ্টান ধর্মকে **গ্রীক খৃষ্টান ধর্ম** বা গোঁড়া খৃষ্টানধর্ম বলা হত। ল্যাটিন খৃষ্টান গীর্জার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল যেমন রোম, তেমনি গ্রীক খৃষ্টানধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাইজান্টিয়াম।

অবশেষে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যও যেমন অপরাহ্নে অস্ত যায়, তেমনি শিল্পে সুন্দর, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী, শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কালক্রমে পতন হ'ল (১৪৫৩)। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সাম্রাজ্যের ভগ্ন স্তুপের উপর তৈরী হ'ল কতকগুলি নবীন রাষ্ট্রের তোড়ন। শুরু হ'ল তখন থেকে ইউরোপের ইতিহাসে নবজাগরণ।

অনুশীলনী

বিশেষভাবে মনে রাখবে :—

১। সাম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান-এর পর কনস্টান্টাইন রোমের সম্রাট হন। তিনি রোম সাম্রাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন।

২। কনস্টানটাইন ছিলেন বীর ও কুশলী সম্রাট। তার সময়েই বাইজান্টিয়ামে রোম সাম্রাজের নতুন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল-এর (সম্রাটের নামানুসারে) প্রতিষ্ঠা হয়। তার রাজত্বকালেই খৃষ্টান ধর্ম বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে।

৩। জাস্টিনিয়ান ছিলেন এ সাম্রাজ্যের সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তার সেনাপতি বেলিসারিয়াসও ছিলেন বীরত্বে প্রসিদ্ধ। জাস্টিনিয়ানের অবদান ছিল বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে। তার সুসংগঠিত আইনবিধিগুলির গুরুত্ব এখনও আইনবিদ্‌রা স্বীকার করেন।

৪। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ছায়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কনস্টান্টিনোপল শিল্পে সাহিত্যে ও নানাবিধ জ্ঞানবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে সে যুগে সারাবিশ্বে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

কোন্ কোন্ দেশ নিয়ে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য গঠিত ছিল? এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? কনস্টাণ্টাইন কত বছর রাজত্ব করেন? তার রাজত্বকালে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি কি? ৩১৩-খৃষ্টাব্দে রাজার আদেশে কি বলা হল? জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন? তার সেনাপতির নাম কি? সেণ্টসোফিয়া কি? কত সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে?

শূন্যস্থান পূরণ কর :—

কৃষ্ণসাগরের তীরে—সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত হল। সম্রাটের নামে নতুন রাজধানীর নাম হল—। জাস্টিনিয়ানের আমলে—সাম্রাজ্য—একত্রিক হয়। কনস্টন্টিনোপলের বণিকরা—মহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :—

(ক) কনস্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে কিভাবে খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে?

(খ) বইজাণ্টাইন সভ্যতা বলতে কি বুঝ?

(গ) জাস্টিনিয়ান কেন আইন সংস্কার করেন?

(ঘ) জাস্টিনিয়ান আইন বলতে কি বুঝ?

৩। রচনাত্মিক প্রশ্ন :—

(ক) বাইজানটাইন সম্রাটদের মধ্যে জাস্টিনিয়ানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন?

() বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে, বাণিজ্য শিল্পকলা ও বিদ্যাচর্চার উন্নতির কথা আলোচনা কর।

করণীয় কাজ :

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য নির্দেশ করে একটি রেখামানচিত্র এঁকে তাতে কনস্টান্টিনোপলের অবস্থান দেখাও।

ইসলাম ও তার প্রভাব

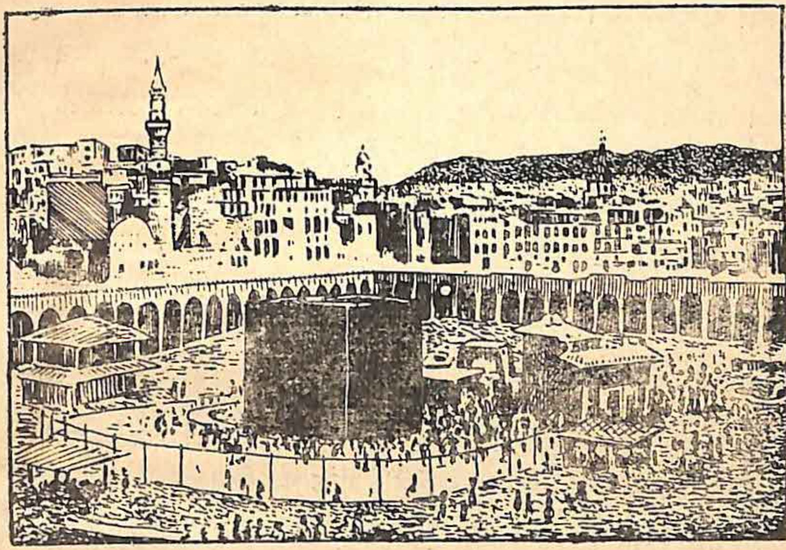
আরব দেশ ও জনগণঃ মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয় পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশে। দেশটির অধিকাংশ মরুভূমি। ইহার তিন দিকে শুধু সমুদ্রের তীরে তীরে ও উত্তর দিকের খানিকটা জায়গায়গাছপালা জন্মায়। এসব অঞ্চলছাড়াও বিভিন্ন মরুদ্যানকে ঘিরে জনবসতি গড়ে ওঠে। কালে নগর বন্দরের পত্তন হয়।

অধিবাসীদের জীবন যাত্রাঃ—আগে আরবদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। মরুভূমির দেশ বলে বেশীর ভাগ ছিল যাযাবর বেদুইন। মরুচর এই বেদুইনরা দস্যুতা করে জীবন ধারণ করত। আর এক শ্রেণীর আরব, ঘর-বাড়ী তৈরি করে চাষ-আবাদ করে জীবন ধারণ করত। সমুদ্রের নিকটে যারা বাস করত তাদের অনেকে জলপথে ব্যবসা- বাণিজ্যও করত।

আরবরা নানা দেবদেবীর পূজা করত। তাদের ধর্মকর্মের কেন্দ্র ছিল **মক্কা**। এখানে 'কাবা' নামে এক কালো পাথর মহম্মদের আগে থেকেই আরবদের পূজো পেত। সে **উপলক্ষে** বছরে এক বিরাট মেলা বসত।

মহম্মদ ও তাঁর উপদেশঃ—আরব দেশের মক্কা শহরে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন মহম্মদ পিতামহের নিকট লালিত পালিত হন। অল্পবয়সেই তাঁকে জীবিকার জন্য সওদাগরী কাজ করতে হয়। পরে খাদিজা নামে এক ধনবতী মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সৎ ও চিন্তাশীল। সবারকাছেই তিনি পরিচিত হলেন 'আল-আমীন' বা সত্যবাদ রূপে। শীঘ্রই তিনি ধর্ম-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে মক্কার কাছে এক পাহাড়ের গুহায় সাধনায় ব্রতীহন। নির্জনে ধ্যান করতে করতে একদিন তিনি 'স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে 'আল্লাহ বা ঈশ্বরের বাণী' শুনতে পান। তা থেকে

তিনি এক অপূর্ব সত্যজানতে পারলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস হ'ল যে ঈশ্বর এক। তিনি মক্কা বাসীদের নিকট গাছ, পাথর ও নানা মূর্ত্তি পূজার অসারতার কথা বলতে লাগলেন। তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের নাম হল ইসলাম। নতুন ধর্মে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়তে দেখে মূর্ত্তি পূজায় বিশ্বাসী মক্কা বাসী তাঁকে শত্রু ভেবে হত্যার চেষ্টা করে।



মক্কার কাবা শরিফ

৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মহম্মদ মদিনায় পালিয়ে যান। মুসলমান পঞ্জিকার আরম্ভ তখন থেকেই। মুসলিম ইতিহাসে তা **হিজরী সন** নামে বিখ্যাত। মদিনায় ইসলাম ধর্মপ্রচার করে তিনি মক্কা অধিকার করেন ও সেখানে ইসলাম ধর্মপ্রচার করেন। মক্কা জয়ের দুবছর পর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

মহম্মদের প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। **ইসলাম আরবী শব্দ। এর অর্থ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ।** ঈশ্বর বা আল্লাহর বাণী নিয়ে কোরাণ হ'ল মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ। কোরাণে ইসলামের মূল নীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই ধর্ম যাঁরা পালন করেন তাঁদের বলা হয় মুসলিম। মহম্মদ আল্লাহর দূত বা রসুল। তিনি বললেন, সকল মুসলিম একে অপরের ভাই। এ ধর্ম যারা গ্রহণ করবেন, তাদের কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আছে। (ক) প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার নামাজ (প্রার্থনা করতে হবে। (খ) প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সকলের সঙ্গে মিলে মসজিদে নামাজ পড়তে হবে। (গ) প্রত্যেকের আয়ের এক অংশ গরিবদের দান করতে হবে। (ঘ) রমজান মাসে দিনের বেলায় জলস্পর্শ না করে রোজা পালন করতে হবে। (ঙ) ব্যায় বহনে সক্ষম ব্যক্তিদের সারাজীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা শরিফ তীর্থ দর্শন করতে হবে (হজ)।

এগুলিই হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ :—

যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শ' বছর পর ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর হতে শুরু করে একশো বছরের (৬৩২—৭৩২ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে মুসলিম অভিযান এশিয়া, আফ্রিকা অতিক্রম করে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এত কম সময়ে অন্য কোন ধর্ম ইসলামের মত দ্রুত প্রসার লাভ করেনি।

মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেন তা ছিল সহজ ও সরল। ইসলামে নানারূপ অনুষ্ঠানের বাহুল্য নাই। মসজিদে কোন বেদী নাই, নাই কোন প্রতিমূর্ত্তি বা ছবি। নামাজ (প্রার্থনা) করার বিধিও খুব সরল। এ সবই সহজসাধ্য মুক্তির পথ বলে লাঞ্ছিত মানুষের মন জয় করে। ফলে ইসলাম ধর্ম মানুষ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। তাই নানা দেশে হয়েছে ইসলামের জয়-জয়কার।

ইসলামে রাজা ও ধর্মগুরু—এ দু'পদের দায়িত্ব ছিল খলিফাপদ অধিকারী একই ব্যক্তির উপর। তাই কে বড়, ইসলামে এ দ্বন্দ্বের বদলে ধর্ম ও রাষ্ট্র এক সূত্রে বাঁধা পড়ে। এই ঐক্যের ফলে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে।

ইসলামে কোন জাতিভেদ নাই। সাম্যের বাণী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এনে দেয় একতার আশীর্বাদ। এ সাম্যের কথা

বিদেশে পৌঁছে দিতে হলে এবং তা জানাতে হলে চাই ধর্ম প্রচারও প্রয়োজনে তরবারির ব্যবহার। ফলে ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে রাজ্য জয়ের আকাঙ্খা মিলে ইসলাম ধর্মপ্রসারে খুব সাহায্য করেছে।

খলিফা (রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মগুরু)

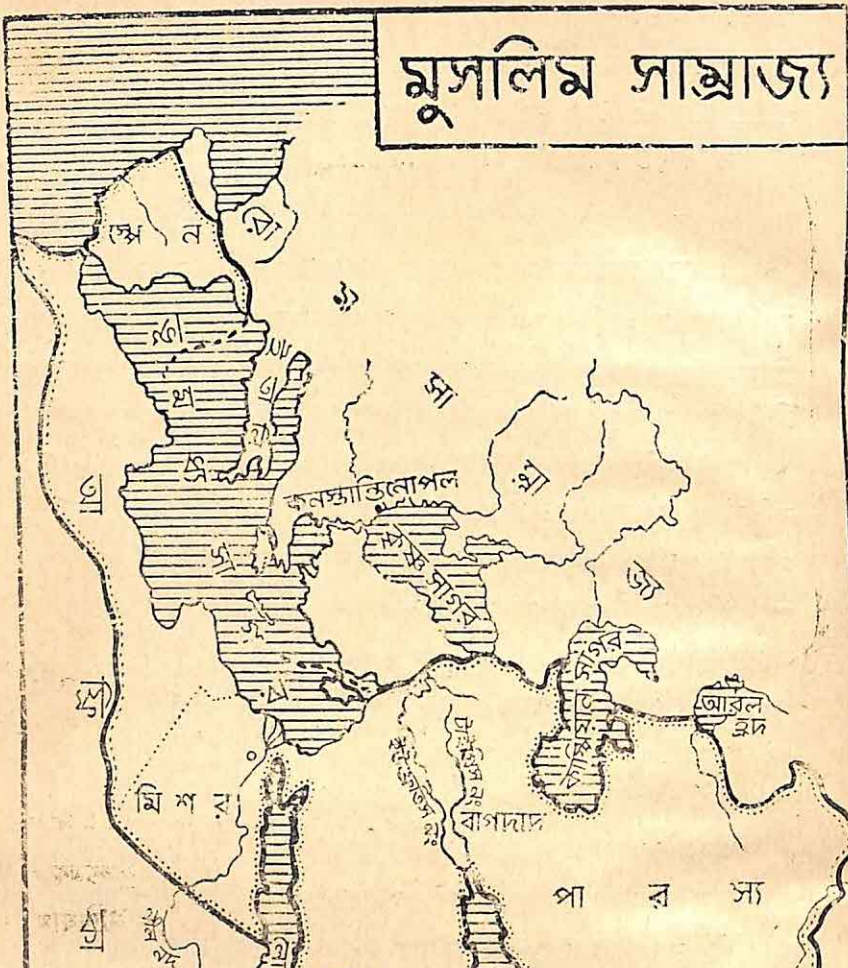
হজরত মহম্মদের পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই শিষ্য **আবুবকর** হলেন মুসলমানদের প্রথম **খলিফা**। রাজ্য শাসন ও ধর্মবিষয়ে তদারকীর সর্বময় কর্তাকে বলা হত খলিফা। আবুবকর ছিলেন আদর্শবান শাসক। তারপর খলিফা হলেন হজরত **ওমর**। তিনি ছিলেন কুশলী, বীর ও ন্যায় পরায়ণ।

প্রথম খলিফার ন্যায় তাঁর জীবনেও আড়ম্বরের কোন স্থান ছিল না কথিত আছে যে, ইরানের দূত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখলেন মুসলমানদের সর্বময় কর্তা ভিক্ষুকদের সঙ্গে মদিনার মসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে আছেন। প্রথম দুই খলিফার আমলে আরবদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা ছিলেন **হজরত ওসমান** ও **হজরত আলী**। এরপর আলির পুত্র **হাসান** খলিফা হন। কিন্তু তাঁকে হটিয়ে দামাস্কাসের শাসনকর্তা **মোয়াবিয়া** হলেন খলিফা।

মোয়াবিয়া মদিনা থেকে রাজধানী নিয়ে গেলেন সিরিয়ার দামাস্কাসে। তাঁর সময় থেকেই খলিফা পদ হল বংশানুক্রমিক। মোয়াবিয়ার বংশধররা ৯০ বছর রাজত্ব করেন। ইতিহাসে এরা **উম্মিয়াদ** বংশ নামে পরিচিত।

উম্মিয়াদ বংশের পর **'আব্বাসিদ বংশ** শাসন ক্ষমতা লাভ করে। এ বংশের আমলে আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ইরাকদেশের টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাস ছিলেন মহম্মদের পিতৃব্য। তাঁরই একজন বংশধর মোয়াবিয়ার বংশধরদের উচ্ছেদ করে খলিফা পদ অধিকার করেন। আব্বাস থেকে এ বংশেয় নাম হয় আব্বাসিদ্ বংশ।



(মানচিত্রে আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে নাও।)

বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে **হারুন অল রসিদ** (৭৮৬—৮০৯ খৃঃ) ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি খুব শক্তিশালী ও আড়ম্বর প্রিয় সম্রাট ছিলেন। তিনি গভীর রাত্রিতে ছদ্মবেশে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়ানো গভীর রাত্রির আশ্চর্য-জনক অনেক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অপূর্ব সাহিত্য, **আরব্য উপন্যাসের** সৃষ্টি। তিনি ছিলেন কীর্তিমান খলিফা। তার সময়ে বাগদাদ জ্ঞানে, গুণে ও শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল।

হারুন-অল রসিদের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন দুর্বল। এই দুর্বলতার সুযোগে পরে আব্বাস বংশীয় খলিফাকে হটিয়ে তুর্কীরা বাগদাদ অধিকার করে নেয়। এভাবে আব্বাস বংশেরও পতন ঘটে।

আরব সাম্রাজ্য—হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে সওয়া'শ বছরের মধ্যে এক বিরাট আরব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। চীন সাম্রাজ্যের মধ্য এশিয়ার সীমান্ত থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত এবং ইউরোপের স্পেন থেকে ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত আরব খলিফাদের অধীনে আসে। (পাশের মানচিত্র থেকে দেখে নাও আরব সাম্রাজ্যের সীমানা কতটা বিস্তৃতি হয়েছিল।)

কর্ডোভা : খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনে আরবদের শাসন স্থায়ী হয় এবং এই শাসন এক গৌরবময় স্বাক্ষর রেখে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার চর্চায় স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা নগরের স্থান ছিল কনস্টানটিনোপল ও বাগদাদের পরেই। এখানে বহু মসজিদ ও স্নানাগার ছিল এবং রাজপথগুলি ছিল পাথরে বাঁধানো। রাজপ্রাসাদ ছিল শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। কার্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে যুগের বিদ্যাচর্চার এক গৌরবময় কেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে এইখানে পড়তে আসত। ছাত্রেরা আরবী-ভাষা শিখে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করত। এখানে চিকিৎসা, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াবার জন্য ইহুদি ও খৃষ্টান পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হত। স্পেনের মুসলমানদের এ বিষয়ে তেমন

গোঁড়ামি ছিল না। কর্ডোভায় ছিল একটি বিরাট **কিতাবমহল** বা পুস্তকাগার। ভারতের **নালন্দার** মত কর্ডোভায় ছিল এক **আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়**।

আরবীয় সংস্কৃতির অবদান :—মানব সভ্যতার ইতিহাসে আরব জাতির অবদান চিরস্মরণীয়। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরব পণ্ডিতগণ জ্ঞানের আলোয় চারিদিক আলোকিত করেছেন। আরব পণ্ডিতগণ ছিলেন যেন এক একটি বিশ্বকোষ। ভারতীয় গণিত ও দশমিক চিহ্ন এবং বীজগণিতের সঙ্গে তারাই ইউরোপের পরিচয় করিয়েছেন। চীনাদের আবিষ্কৃত কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র, কাগজ ও বারুদের ব্যবহার তাঁরাই ইউরোপীয়দের শিখিয়েছেন। ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও আরবদের দান ছিল অসামান্য। পারদের ব্যবহার তাদেরই কীর্তি। আরবীয় বণিকরা নৌ-বিদ্যা আয়ত্ব করে বিভিন্ন জাতিকে এ বিদ্যায় পথ দেখিয়েছেন। তাদের পণ্য সম্ভার, যেমন মশালের সূক্ষ্মবস্ত্র মসলিন, দামাস্কাসের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ও বাগদাদের সুগন্ধ নির্যাস ইউরোপের চাহিদা মিটিয়েছে। কার্পাস তুলো থেকে তৈরী সূতোর কাপড় তাঁরাই ভারত থেকে নিয়ে যায় ইউরোপে। ইংরেজী 'কটন' শব্দটি আরবী 'কতুর্ন' থেকে এসেছে। আলিবাবা ও আলাদিনের গল্পও আমরা পেয়েছি আরবীয়দের কাছ থেকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে মুসলিম পণ্ডিতগণ অনেকাংশে ইউরোপের শিক্ষাদাতার ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি ইউরোপের **রেনেসাঁ বা নবজাগরণের** উদ্ভব ও বিকাশে আরবীয়দের অবদান সামান্য ছিল না।

কয়েকজন বিখ্যাত আরব পণ্ডিতদের পরিচয় :

হুনেন ইবন ইশাক—ইশাক বাল্যকালে বাগদাদের এক চিকিৎসকের অধীনে ঔষধ মাপার কাজ করতেন। পরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে তিনি গ্রীকভাষা শেখেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রীক

গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। সবার কাছে সেগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফলে তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা স্বয়ং তাঁর অনুবাদ করার কাজে একটি দপ্তর খুলে তাঁকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

ইবন-সিনা (আভেসিনা) :—ইবন সিনা ছিলেন নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত। দর্শন, চিকিৎসা জ্যামিতি, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র এবং শিল্প সম্বন্ধে তিনি প্রায় একশো গ্রন্থ লিখে গেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর রচিত "ঔষধ শাস্ত্র" ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের নিকট অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থ ছিল একমাত্র অবলম্বন। ইউরোপে তিনি আভেসিনা নামে খ্যাত।

ইবন-রসিদ (আভেরোস)—ইউরোপে বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইবন রসিদ অমর হয়ে আছেন। তিনি জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টোটলের প্রায় সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বসন্ত রোগ এবং চোখের ভেতরের গঠন প্রণালী সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা লিখে গেছেন। ইউরোপে তিনি আভেরোস নামে প্রসিদ্ধ।

ইবন খালদূন—ইবন খালদূন মুসলমান ইতিবৃত্ত ও রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল বিশ্বের ইতিহাস। কথিত আছে যে, তিনি ৪০ বছর ধরে প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখে গেছেন।

অলবেরুণী—অলবেরুণী ছিলেন নানা ভাষায় পণ্ডিত। তিনি গণিত, জ্যোতিষ, জ্যামিতি এবংপ্রাচীন অনেক জাতীর বর্ষগণনা সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন। তিনি সুলতান মামুদের সময় ভারতে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতের বিবরণ দিয়ে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ব করে হিন্দুদের জ্যোতিষ ও গণিতের বহু মুল্যবান তথ্য তাঁর ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন।

ইসলামের কৃতিত্বে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া :

ইসলামের কৃতিত্বে ইউরোপে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আরবদের নতুন নতুন রাজ্য জয়ের পর্বে ইউরোপের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাঁধে। কিন্তু কালক্রমে দুটিই কাছাকাছি আসতে একে অপরের জ্ঞান-বিদ্যা-চর্চার অমূল্য সম্পদ গ্রহণ করে।

স্পেনে আরবদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৭১১ খৃঃ) থেকে 'টুর' এর যুদ্ধ (৭৩২ খৃঃ) এমন কি তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত ইউরোপ মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তারপর থেকে মুসলিম শক্তি যুদ্ধের মনোভাব ত্যাগ করে। তখন থেকে প্রতিরোধের বদলে ইউরোপের মানুষ আরবদের জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার অমূল্য সম্পদ বিনা দ্বিধায় আপন করে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে।

সুতরাং, প্রথম পর্যায়ে, আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে ইউরোপের অধিবাসীরা প্রতিরোধ করেছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দিক থেকে ইউরোপ আরবদের ভীষণভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরব সভ্যতার অবদান ইউরোপের মানুষ সাগ্রহে নিজেদের সম্পদ করে নিয়েছে।

অনুশীলনী

বিশেষ করে করে মনে রাখবে :

১। এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আরবদেশ। অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল যাযাবর বেদুইন। অল্পসংখ্যক লোক চাষবাস ও ব্যাবসা বাণিজ্য করত। তারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল। মক্কা হল তাদের তীর্থস্থান।

২। মক্কা নগরে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি পিতামাতাকে হারিয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে বড় হন। আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে তিনি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে দেহ রক্ষা করেন।

৩। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'কোরাণ'। প্রত্যক মুসলমানকে পাঁচটি নিয়ম পালন করতে হয়। সেগুলি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ।

৪। ইসলাম ধর্ম পালনে সহজ সরল বিধি, সাম্যের বাণী. কীর্তিমান খালিফাদের চেষ্টা প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের প্রসারে খুব সাহায্য করে।

৫। মহম্মদের মৃত্যুর পর চারজন খলিফা রাজত্ব করেন। তারপর আসে উম্মিয়াদ বংশ, তারপর আব্বাসিদ বংশ। এ বংশের খলিফা হারুন অল রশিদ ছিলেন খুব খ্যাতিমান। তাঁর সময় বাগদাদ ধনে জনে, শিল্পে, স্থাপত্যে খুবই উন্নত হয়ে ওঠে।

৬। আরব মুসলমানদের রাজ্য জয়ের সঙ্গে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চলে। ফলে জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রভূত উন্নতি করে। পৃথিবীর নানা দেশ নানাভাবে তাদের নিকট ঋণী। পৃথিবীর সভ্যতার ভাণ্ডারে আরব পণ্ডিতদের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—

আরবের বেদুইনরা কি করে জীবন ধারণ করত? মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম কি? খাদিজা কে ছিলেন? হিজরী সন বলতে কি বুঝ? হারুন-অল-রশিদ কে ছিলেন? কোন্ যুদ্ধের পর আরব মুসলমানরা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোভাব ত্যাগ করে?

আত্ম সমীক্ষা

সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি কি কি?

(খ) ইবন সিনা বা আভেসিনা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ?

(গ) ইসলামের কৃতিত্ব ইউরোপ কিভাবে নিয়েছিল?

পূর্ণাঙ্গ উত্তর লিখ :—

(ক) হজরত মহম্মদের জীবন-কহিনী সংক্ষেপে লেখ।

(খ) মানব সভ্যতার ইতিহাসে আরবীয় সংস্কৃতির অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

করনীয় কাজ :—

(ক) আরব সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশক একটি মানচিত্র এঁকে তা'তে মক্কা, মদিনা, দামাস্কাস, বাগদাদ, মিশর, কর্ডোভা প্রভৃতি স্থানগুলি বসাও।

(খ) আরব্য উপন্যাস সংগ্রহ করে পড়বে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিমইউরোপ

শার্লিমেন :—খালিফা হারুণ-অল-রসিদ যখন বাগদাদে রাজত্ব করছেন, তখন শার্লিমেন পশ্চিম ইউরোপের সম্রাট। তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কদের নেতা। রোমের পতনের পর যে সব জার্মান উপজাতি নতুন নতুন রাজ্য গড়ে তোলে, ফ্রাঙ্করা ছিল তাঁদের মধ্যে একটি। তাঁরা উত্তর গল (ফ্রান্স) ও দক্ষিণ জার্মানী জুড়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

ফ্রাঙ্কদের মধ্যে ক্যারোলিনজিয়ান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শার্লিমেন। **ফরাসী ভাষায় শার্লিমেন শব্দের অর্থ মহান চার্লস।** তিনি শুধু ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাসেই নয়, সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে বীর ও সুশাসকরূপে অমর হয়ে আছেন! তিনি ৭৬৮ থেকে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে ফ্রাঙ্ক জাতির রাজা হওয়ার পর শার্লিমেন এক বিরাট সামাজ্য স্থাপনে যত্নবান হন। তিনি প্রাচীন রোমান আদর্শের পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এছাড়া, ফ্রাঙ্কজাতি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর, এ ধর্মের প্রসারেও তিনি সচেষ্ট হন। এই দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। পঞ্চাশটির ও বেশী যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

উত্তর-ইতালির লোম্বার্ড, জার্মানীর স্যাক্সন, স্পেনের স্যারাসেন প্রভৃতি জাতি তাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ফলে সমগ্র জার্মানী ফ্রান্স, উত্তর ইটালি, স্পেনের অংশ ও ভূমধ্যসাগরীয় কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে তার সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ফলে শার্লিমেনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীকরূপে পবিত্র রোমসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোম সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রবর্তন (?)

শুধু শক্তিশালী যোদ্ধারূপেই নয়, খৃষ্টান ধর্মের প্রতি শার্লিমেন ছিলেন গভীর অনুরাগী। ফ্রাঙ্কদের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে প্রধান ধর্ম গুরু পোপের সঙ্গে তাঁদের খুব সদ্ভাব গড়ে ওঠে। শার্লিমেনও নিজেকে খৃষ্টান ধর্মের রক্ষক বলে মনে করতেন। এই সময়ে পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। তিনি থাকতেন রোম নগরে। শত্রুর চক্রান্তে বিপদে পড়ে তিনি শার্লিমেনের সাহায্য চান। সঙ্গে সঙ্গে শার্লিমেন সসৈন্যে রোমে এসে লিও-কে নির্দোষ বলে পোপের পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ঘটনাটি ঘটে ৮০০ খৃষ্টাব্দে। এ বছরেই বড় দিনের (২৫ শে ডিসেম্বর) উৎসবের সময় রোমের



(শার্লিমেন)

সেন্ট পিটার গীর্জায় শার্লিমেন যখন নতজানু হয়ে যীশুর উপসনা করছিলেন তখন উপস্থিত ধর্মপ্রাণ নরনারী এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন। তাঁরা দেখলেন, পোপ তৃতীয় লিও ঈশ্বরের নামে শার্লিমেনের মাথায় রোমান সম্রাটগণের সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে 'সম্রাট' রূপে ঘোষণা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনগণ বলে উঠলেন—"**মহান চার্লস আজ রোমের সম্রাট হলেন। তিনি চিরবিজয়ী ও দীর্ঘজীবি হউন।**' পোপের নেতৃত্বে সম্রাটরূপে শার্লিমেনের এ

রাজ্যাভিষেক উৎসবের ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব—রাজ্যাভিষেকের এই ঘটনা থেকে মানুষের মনে এমন ধারণা হল যে, পশ্চিম ইউরোপে যেন আগেকার রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল! অভিষেকের ফলে শার্লিমেন সম্রাট উপাধি লাভ করলেন। তখন থেকে তার সাম্রাজ্য পবিত্র রোম



সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হল। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রথম পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও শার্লিমেনের সাম্রাজ্য আয়তন ও অন্যান্য দিক থেকে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সাথে তুলনীয় ছিল না এবং শার্লিমেন নিজেও রোমান ছিলেন

না; তথাপি তাঁর সাম্রাজ্যকে সাধারণ মানুষ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলেই মনে করেছিল এবং স্বাগত জানিয়েছিল।

রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্বন্ধ—

পোপের দ্বারা শার্লিমেনের রাজ্যাভিষেকের ফলে খৃষ্টান গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শার্লিমেন পোপকে সাহায্য করার, গীর্জার সম্পত্তি রক্ষা করার এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে এই মৈত্রী দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। পরবর্তী কালে খৃষ্টান ধর্ম জগতের উপর কার প্রাধান্য থাকবে—পোপের কিম্বা সম্রাটের, অর্থাৎ **যিনি মুকুট পরিয়েছেন তিনি বড় না যিনি মুকুট পরেছেন তিনি বড়**—এই নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে বহুদিন ধরে বিরোধ চলতে থাকে।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক—শার্লিমেন কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। তিনি নিজে নিরক্ষর হলেও শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারতেন এবং গ্রীক ভাষাও বুঝতেন। সংগীত, ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র, গাঁথা ও কাব্য-গ্রন্থের অনুলিপি করতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিদ্যা ও শিল্প চর্চা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত **'প্রাসাদ বিদ্যালয়'** উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশে প্রতিটি খ্রীষ্টান মঠে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

শার্লিমেনের রাজসভা—শার্লিমেনের রাজসভায় নানা গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। ইংলণ্ডের **আলকুইন** পিসার **পিটার**, স্পেনের **আগোবার্ড, ও থিওডল্ফ**, লোম্বার্ডির **পল** প্রভৃতি সে সময়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। শার্লিমেনের জীবনী লেখকও তাঁর সচিব **আইনহার্ডের** নামও উল্লেখযোগ্য।

শিল্পের পৃষ্ঠপোষক রূপেও শার্লিমেন খুব সুনাম অর্জন করেন। রাইন নদীর তীরে আকেন বা আইলা-স্যাপেল নগরে তার রাজধানী ছিল। পরে ইহার নাম রাখা হয় নতুনরোম। সেখানে মনোরম রাজপ্রাসাদ ও গীর্জা তার শিল্পকীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শনরূপে সকলের প্রশংসা লাভ করে।

৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লিমেনের মৃত্যু হয়। তিনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো জ্বেলে পশ্চিম ইউরোপে 'এক নবযুগের সূচনা করেন। নবম শতাব্দীর নবজাগরণের (কেরোলিঞ্জিয়ান রেনেসাঁ) তিনিই ছিলেন পুরোধা। তার নানাবিধ মহৎ গুণের জন্য উপযুক্ত ভাবেই তিনি 'মহান' রূপে অ্যাখায়িত হন।

মঠ—আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁরাই পরিচালনা করতেন গীর্জাসংলগ্ন বিদ্যালয়গুলি। শীঘ্রই বিজয়ী জার্মানদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির সরকারী কাজে যাজকদের নিযুক্ত করা হতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদও লাভ করেন। ফলে তাদের মধ্যে সংসার জীবন যাপন, ব্যবসা-বানিজ্য, জমি জমার অধিকারও ভোগ স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। সামন্ত প্রথার প্রভাব গীর্জার উপরও পড়তে যাকে। গীর্জার অধীনে ভূসম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গীর্জাও সামন্ত বাবস্থার একটি অঙ্গে পরিণত হয়। রাজা ও সামন্ত প্রভুরা ধর্মযাজক ও গীর্জার বিভিন্ন পদে নিজেদের পছন্দমত লোক নিযুক্ত করতে থাকে। যাজকগণও রাজা ও সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে ভূমিদাসদের শোষণ-কার্যে হাতে হাত মেলায়।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—কিন্তু একশ্রেণীর যাজক যাঁরা খ্রীষ্টান ধর্মের মূল আদর্শগুলি, যেমন—ত্যাগ, দয়া পবিত্রতাকে জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করে। তাঁরা ধনসম্পদ, জাঁকজমক ও ক্ষমতার প্রতি লোভ প্রভৃতি

ছেড়ে ধর্মকর্ম ও মানুষের সেবাকেই মুক্তির পথরূপে বেছে নেয়। এদেরই বলা হত সন্ন্যাসী। লোকালয় ছেড়ে যারা নতুন জীবন বেছে নেয় তারা গীর্জার সংলগ্ন কোন ঘেরা জায়গায় দলবদ্ধ ভাবে বাস করত। এগুলিকেই বলা হত মঠ। **সন্ন্যাসিনীদের** জন্যেও আলাদা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠে একজন করে মহান্ত থাকতেন। তাকে বলা হত অ্যাবট। সন্ন্যাসী-দের কেহ কেহ মঠের বাইরে সাধারণ নর-নারীদের ধর্ম উপদেশ দিতেন। তাদের বলা হত ফ্রায়ার (ভাই)



সন্ন্যাসী পাদরী

মঠে জীবনযাত্রা—মঠের জীবনযাত্রা ছিল সরল। সন্ন্যাসীদের গায়ে মোটা কাপড়ের চাদর জড়ানো থাকত। দড়ি দিয়ে কোমরে তা শক্ত করে বাধা থাকত। খুব ভোরে তাঁরা মঠের উপাসনাগারে ভজন করতেন। তাঁদের খাদ্য ছিল খুব সাধারণ। মঠে সকলকে খুব পরিশ্রম করতে হত। নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরা তৈরী করতো। মঠের সীমানার বাইরের জমিতে চাষ-আবাদ করে তারা শস্য ফলাতেন। মঠের বাগানে উৎপন্ন হত শাকসব্জী ও ঔষধের লতাগুল্ম ইত্যাদি। তাছাড়া পশুপালন, রান্নাবান্না, কাপড়ধোয়া মঠ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি করণীয় কাজ ছিল।

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মাবলী—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বেনেডিক্ট নামে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ইটালীর মন্টিক্যাসিনোতে প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য কতকগুলি পালনীয় নীতি নিয়ম চালু করেন। এগুলি হল ধর্ম মেনে চলা, দরিদ্র ও পবিত্র জীবনযাপন করা ইত্যাদি। এ ছাড়া শ্রমের মধ্য দিয়ে ভগবানের উপাসনা করার কথাও তিনি বলেন। পশ্চিম ইউরোপের নানাস্থানে যেসব মঠ গড়ে উঠেছিল, সেগুলিতে বেনেডিক্টের নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালিত হত।

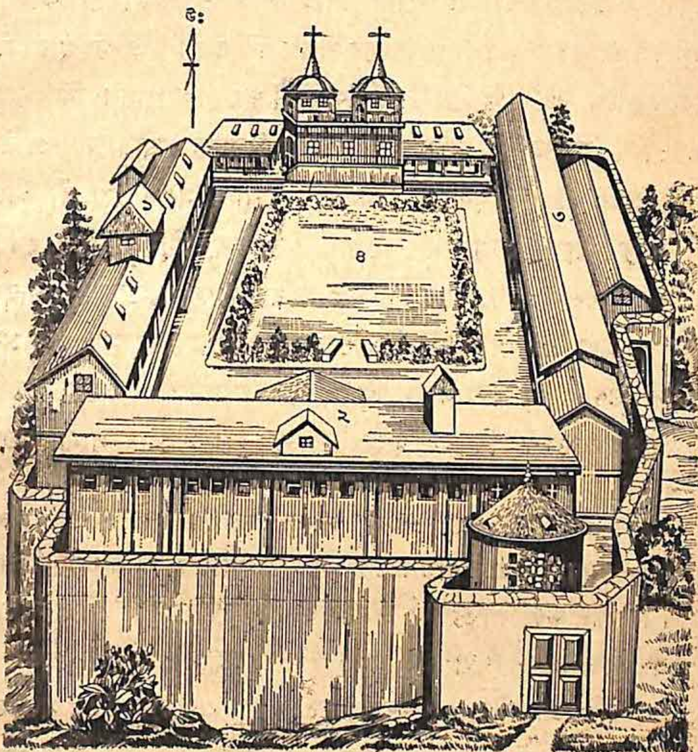
জ্ঞানবিদ্যার সংরক্ষণ ও বিস্তারে মঠগুলির ভূমিকা—মধ্যযুগের জনজীবনে মঠগুলির প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। নানারূপ জনহিতকর কাজ যেমন—ক্ষুধার্তকে অন্ন, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়, রুগীকে চিকিৎসা, দুঃস্থকে সেবা করে মঠগুলি সে যুগের মানুষের মন জয় করে। খৃষ্টানধর্ম প্রসারেও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।

মধ্যযুগে মঠগুলি সভ্যতার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। রোমান সংস্কৃতির ধারকরূপে মঠগুলিতে ল্যাটিন ভাষার চর্চা হত। ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন ছাড়াও সন্ন্যাসীগণ দর্শন, সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি রচনাব কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। মূল্যবান নানা পুঁথির সংরক্ষণ ও অনুলিপি প্রস্তুত করে সে যুগে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে মঠগুলির অবদান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টান মঠগুলিকে দুর্নীতি মুক্ত করতে ক্লুনীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন :—কালক্রমে সামন্তপ্রথার প্রভাবেগীর্জার ধর্মযাজকদের মধ্যে অনেকেই বিলাসিতা ও অলস জীবন-যাপনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে দেখা দেয় নানারূপ অনাচার। ফলে গীর্জার ভেতরেও নানারূপ অনিয়ম দেখা দেয়। গীর্জার বিভিন্ন পদ পণ্য সামগ্রীর মত বিক্রয়ের প্রথাও গড়ে ওঠে। যোগ্যতার বদলে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের যাজক নিযুক্ত করা হতে থাকে। এমনকি যাজকদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে গীর্জার পদগুলি দখল করার চেষ্টাও দেখা দেয়।এভাবে দুর্নীতি ও অনাচার বৃদ্ধির ফলে অনেক মঠের যাজক ও মহান্তদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

খৃষ্টান গীর্জাকে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করার জন্য, যাজক সম্প্রদায়কে ইহ জীবনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্মের মূল আদর্শগুলি মেনে চলার মনোভাব সৃষ্টি করতে এক ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। **একাদশ শতাব্দীতে—বার্গাণ্ডীর অন্তর্গত ক্লুনীর মঠ থেকে এই সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে এই আন্দোলন ক্লুনীর ধর্মসংস্কার আন্দোলল নামে বিখ্যাত।**

ক্লূনীর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল—(ক) খৃষ্টান গীর্জার উপর রাজার হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ; (খ) গীর্জার বিভিন্ন পদ সমূহে রাজা ও সামন্ত প্রভুদের পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়োগের অধিকার বাতিল করা ;



মঠ : ১। ভাড়ার ঘর ; ২। খাবার ঘর ; ৩। শয়ন ঘর। ৪। আঙ্গিনা।

(গ) খৃষ্টান গীর্জার উপব একমাত্র ধর্মগুরু পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ; (ঘ) যাজকদের বিলাসিতা ও বিবাহ করে সংসার জীবন-যাপন বন্ধ করা ; (ঙ) গীর্জার পদগুলির বিক্রয় ব্যবস্থা বাতিল করা এবং (চ) খৃষ্টান ধর্মের মূল আদর্শগুলিকে জীবনে অভ্যাস করা। ক্লূনীর এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পদাদিতে নিয়োগ নিয়ে সমস্যা :—পশ্চিম ইউরোপে সামন্ত ব্যবস্থার অঙ্গরূপে খ্রীষ্টান গীর্জার প্রধান বা বিশপ নিয়োগে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানে রাজা নব-নিযুক্ত বিশপকে একটি আংটি ও দণ্ডের দ্বারা ঐ পদে অভিষিক্ত করতেন। বিশপও রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতেন। এ ব্যবস্থার ফলে রাজার পক্ষে খৃষ্টান গীর্জার উপর খবরদারী খুব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্লূনীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন রাজার এ ক্ষমতার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ শুরু করে। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে তখনকার পোপ সপ্তম গ্রেগরী গীর্জার পদাদিতে নিয়োগের ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। বিশপ পদে নয়োগের এই অধিকারকে কেন্দ্র করে রাজা ও পোপের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়। অবশেষে ১১২২ খৃষ্টাব্দে **ওর্মসের চুক্তির** ফলে বিশপ পদে নিয়োগের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে একটি আপোষ মিমাংসা সম্ভব হয় এবং এই বিরোধ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে।

মঠ ও গীর্জা সংলগ্ন কোন কোন বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর—মধ্যযুগেজ্ঞান-বিদ্যার চর্চা খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষার জন্য প্রতিটি মঠ ও গীর্জায় থাকত বিদ্যালয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। শীঘ্রই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে প্রাচ্যের উন্নত সভ্যতার ছোঁয়ায় ইউরোপে শিক্ষার আগ্রহ ও জ্ঞানবিদ্যার চর্চা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা মেটাতে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কখনও মঠ ও গীর্জা সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিকেই কেন্দ্র করে কখনও বা কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট ছাত্র সমাবেশ থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের নানা স্থান থেকেই ছাত্র আসত বলে এরূপ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বলা হত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে খুব নামকরা ছিল সেলার্নো, বোলোনা প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, কোলন প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

প্রধানতঃ ব্যাকরণ, অলংকার, তর্ক, ধর্ম, আইন, চিকিৎসা অংক, সংগীত প্রভৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—যেমন সেলার্নো চিকিৎসাবিদ্যার জন্য, বোলোনা আইনবিদ্যার জন্য, প্যারিস ও আক্সফোর্ড ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্য ইত্যাদি। প্রথম দিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতেন, তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতেন। পরে অবশ্য শুধু ডিগ্রীর মোহে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতেন।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা :

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রান্সের আবেলার্ড, জার্মানীর আলবার্ট ম্যাগনাস, ইটালীর টমাস একুইনাস্, ইংলণ্ডের রোজার বেকন্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের আবেলার্ড ছিলেন বড় দার্শনিক। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। জার্মানীর আলবার্ট ম্যাগনাস ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তিনি উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা করতেন। ইটালীর একুইনাস ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে 'সামাথিওলজিকা' নামে বিখ্যাত বই লেখেন। তিনি প্রচার করেন যে, ধর্ম শুধু বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তির উপরও তা প্রতিষ্ঠিত। রোজার বেকন্ ছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, চশমার কাঁচ ও বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইটালীর কবি দান্তে ও ইংলণ্ডের লেখক চসার বিশেষভাবে স্মরণীয়। **দান্তের কাব্য 'ডিভাইন কমেডি' ও চসারের 'ক্যাণ্টারবেরির গল্প' বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।**

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল স্বয়ংশাসিত। এগুলি নানা বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ছাত্রজীবনে কষ্ট এবং আনন্দ দুই-ই ছিল। ছাত্ররা বহু দূরদেশ থেকে বিশেষ বিশেষ অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য সমবেত হত। সাধারণতঃ তারা আবাসিক ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করত এবং একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক দেশের ছাত্ররা এক একটি ক্লাব বা সংঘ গড়ে তুলত। কখনও বা একদেশের ছাত্রদের সংগে অন্য দেশের ছাত্রদের ঝগড়াঝাটি লেগে যেত।

ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক—অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করত। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অধ্যাপকরা ল্যাটিন ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন। তারপর ঐ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত।

বিতর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা ঐ বিষয়ে কতখানি জ্ঞান অর্জন করল বিচার করা হত। পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক উভয় প্রকারের ছিল।

পাঠ্য তালিকা—মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রথমে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হত। সেগুলি ছিল ব্যাকরণশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, সংগীত-শাস্ত্র। ক্রমশঃ জ্ঞান-বিদ্যাচর্চা প্রসারের ফলে নতুন নতুন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্য তালিকায় স্থান পেতে থাকে। বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও অন্যান্য কলাবিদ্যা প্রভৃতি।

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান-বিদ্যার উচ্চতম ও ব্যাপক অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে নানা সংস্কার বন্ধন থেকে মানুষের চিন্তা-বিচার-বিবেচনা তথা যুক্তির মুক্তি ঘটিয়াছে। ফলে এই নবজাগ্রত বুদ্ধিশক্তিতে শক্তিমান হয়ে মানুষ দুর্বার গতিতে এগিয়েছে।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :—

১। জার্মান উপজাতিদের অন্যতম ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন শার্লিমেন। তিনি ছিলেন বীর৷ কুশলী ও শিক্ষানুরাগী। তিনি বহুযুদ্ধে জয়লাভ করে পঃ ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর চেষ্টায় খৃষ্টান ধর্ম খুব প্রসার লাভ করে।

২। তিনি পোপকর্তৃক রোমের সম্রাট বলে ঘোষিত হন। পশ্চিম ইউরোপে শার্লিমেনের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে তা রোম সাম্রাজ্যেরই

পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে মানুষের মনে ধারণা জন্মায়। তাই তার সাম্রাজ্য পবিত্র রোম সাম্রাজ্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৩। শার্লিমেনের রাজত্বকালে শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পের প্রভুত উন্নতি হয়। তার উৎসাহে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে কেরোলিঞ্জিয়ান রেনেসাঁ বলে অভিহিত করে থাকেন। শার্লিমেন তার নানাবিধ গুণের জন্য অমর হয়ে আছেন।

৪। মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার প্রভাব গীর্জাগুলির উপরও পড়ে। সামন্ত প্রভুদের ন্যায় গীর্জার ধর্মযাজকগণও তাঁদের অধীনে বিরাট জমিতে বাঁধা ভূমিদাসদের শোষণ করতে থাকে। বিরাট ভূসম্পত্তি থেকে ধনাগমের ফলে তাঁদের জীবনে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। কিন্তু এক শ্রেণীর ধার্মিক যাজক ত্যাগ, দয়া ও পবিত্রতাকে জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করে। তাঁদের বলা হত সন্ন্যাসী।

৫। শীঘ্রই দুর্নীতিগ্রস্ত যাজকদের বিরুদ্ধে এবং রাজা ও সামান্ত প্রভুদের গীর্জার উপর খবরদারীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীতে ক্লুনীর মঠ থেকে এই আন্দোলন শুরু হয় বলে ইহা ক্লুনীর আন্দোলন নামে খ্যাত।

৬। রাজার ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা থেকে রাজা ও পোপের মধ্যে একে অপরকে অপদস্থ করার কৌশল গ্রহণ করে। এই বিরোধ চলে দীর্ঘ দিন ধরে। অবশেষে ১১২২ খৃষ্টাব্দে ওর্মসের চুক্তির ফলে ইহা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

৭। মধ্যযুগে প্রথম দিকে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা খৃষ্টান ধর্মযাজক দেরমধ্যেসীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে প্রাচ্যের উন্নত সভ্যতার ছোঁয়া লাগে ইউরোপে। শিক্ষার আগ্রহ থেকে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে সালার্নো বোলোনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, কোলন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮। এযুগে পণ্ডিতদের ভাষা ল্যাটিনের বদলে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে ইটালীয়, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) শার্লিমেন কে ছিলেন ? (খ) তাঁর সমসাময়িক মুসলমানদের খালিফা কে ছিলেন ? (গ) শার্লিমেন ফ্রাঙ্কদের কোন্ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ?

(ঘ) শার্লিমেন কথাটির অর্থ কি ? (ঙ) শার্লিমেন কত বছর বয়সে ফ্রাঙ্কদের রাজা হন ? (চ) তিনি কতগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেন ? (ছ) তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম কি ? (জ) তাঁর সময়ে পোপ কে ছিলেন ? কত-খৃষ্টাব্দে তিনি রোমের সম্রাট হন ? তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে কি বলা হত ? (ট) তাঁর জীবনী লেখক কে ছিলেন ? (ঠ) তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ? (ড) কত খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় ? (ঢ) সেণ্ট বেনেডিক্ট কে ছিলেন ?

আত্মসমীক্ষা

শূন্যস্থান পূরণ কর :—(ক) শার্লিমেন — থেকে — খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শার্লিমেনের নিকট উত্তর ইটালীর — জার্মানীর — স্পেনের —প্রভৃতি জাতি পরাজয় স্বীকার করে। ৮০০ খৃষ্টাব্দের উৎসবের সময় রোমের — গীর্জায় শার্লিমেন যখন নতজানু হয়ে — উপাসনা করছিলেন, তখন উপস্থিত ধর্মপ্রাণ নরনারী এক — দৃশ্য দেখলেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

১। পোপ কর্তৃক শার্লিমেনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত জনগন কি বলে উঠলেন ? ২। শার্লিমেনের রাজসভায় কোন্ কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ? ৪। মঠে সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা. জান লিখর ৫। বেনেডিক্টের নিয়মাবলী কি কি ? ৬। সভ্যতার ক্ষেত্রে মঠগুলি। অবদান কি ? ৭। ক্লুনীর অন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলি কি কি ছিল ? ৮। ওর্মসের চুক্তির ফলে কি হল ? ৯। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে গড়ে ওঠে ? ১০। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত ?

পূর্ণাঙ্গ উত্তর লেখ :—

১। মধ্যযুগে সম্রাট ও পোপের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি উল্লেখ করে কি ভাবে সে বিরোধ সাময়িক ভাবে বন্ধ হয় তা আলোচনা কর।

২। ক্লুনীর ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত প্রথা

সামন্ত প্রথা :—রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে শাক্তিশালী সম্রাটের শাসন শেষ হয়। সাম্রাজের ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে ওঠে বিজয়ী জার্মান উপজাতিদের ভিন্ন ভিন্ন প্রায় স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু একতার অভাবে এগুলিও তেমন শক্তিশালী ছিলো না। ফলে রাজ্যে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। এ অবস্থার সুযোগে নর্ম্যান, ম্যাগিয়ার প্রভৃতি বাইরের শত্রু একের এক পর সেসব রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। একদিকে রাজ্যগুলির ভেতরে যখন দুর্বল শাসন, অপরদিকে তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাজারা এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য রাজ্যের ভূমি রক্ষার দায়িত্ব মুষ্টিমেয় শক্তিশালী জমিদার বা সামন্তদের হাতে ছেড়ে দেয়। বড় সামন্তরা আবার ছোট সামন্তদের মধ্যে এবং ছোট সামন্তরা সর্বনিম্নে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দিতেন! এরূপ ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় **সামন্ত প্রথা**। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে ভূমিকে কেন্দ্র করেই এ প্রথার উদ্ভব হয়।

ভূমি ও মানুষে মানুষে সম্পর্ক—মধ্যযুগে ইউরোপের মত আমাদের দেশেও জমিদারী কিম্বা জায়গীরদারী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ব্যবস্থায় সেনাপতি, আমীর ওমরাহ প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বেতনের বদলে অনেক সময় সম্রাট বা সুলতানদের কাছ থেকে জায়গীর রূপে জমি পেত। বিনিময়ে তাঁরা যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে রাজা কিম্বা বাদশাহকে সাহায্য করতেন এবং জমির আয়ের নির্দিষ্ট অংশ তাঁদের খাজনারূপে দিতেন।

জমির এ ধরনের বন্দোবস্ত মধ্যযুগে ইউরোপে ছিল আরও সংগঠিত। রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি নিজের জন্য একটা বড় অংশ রেখে বাকী জমি মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এদের বলা হত সামন্ত বা বড় জমিদার। তাদের অধীনে আবার ছোট ছোট জমিদার বা সামন্ত সৃষ্টি করা হত। সর্বনিম্নে ছিল কৃষক।

সামন্ত ব্যবস্থায় ক্রমোচ্চস্তর বা শ্রেণীবিভাগ—বড় সামন্ত ও রাজার সঙ্গে যেমন আনুগত্যের চুক্তি হত, ছোট সামন্তও তেমনি চুক্তি করত বড় সামন্তের সঙ্গে। এভাবে সবার উপর রাজা এবং সবার নীচে কৃষকের মধ্যে **কয়েকটি সামন্ত স্তর** সৃষ্টি হয়। এদের সকলের বোঝা বহন করতে হত সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের কৃষকদের।

মধ্যযুগে গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষিই ছিল মূল উৎপাদন ও অর্থনীতির ভিত্তি। কৃষি-নির্ভর সমাজে ভূমিই ছিল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। এই ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামন্ত ব্যবস্থা। বড় সামন্ত থেকে কৃষক পর্যন্ত প্রত্যেকেই যার কাছ থেকে ভূমির অধিকার পেত তাঁর প্রতি আনুগত্য ও কতকগুলি দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকত। দায়িত্বগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—(ক) যুদ্ধের সময় প্রভুর জন্য সৈন্য জোগানো ও তাঁর হয়ে যুদ্ধ করা, (খ) স্থানীয় বিচার কাজে সাহায্য করা; (গ) কোন লড়াই-এ প্রভু বন্দী হলে তাঁর মুক্তিমূল্যের ব্যবস্থা করা, (ঘ) প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাইট পদবী লাভের সময় অর্থ দেওয়া (ঙ) প্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়েতে অর্থের যোগান দেওয়া ইত্যাদি।

সামন্ত প্রথায় পদমর্যাদার ভিত্তিতে এমন করেকটি স্তর ভেদ গড়ে ওঠে যার শীর্ষে ছিলেন রাজা। তাঁর নীচে লর্ড, তাঁর নীচে কাউন্ট এবং সবার নীচে কৃষক। সমাজে মর্যাদার ক্ষেত্রেও স্তর ভেদ মেনে চলা হত। নানারূপ করণীয় কাজের বিনিময়ে কৃষকরা ভূমির অধিকারী সামন্ত প্রভুর কাছে বিপদের সময় সাহায্য পেত। সামন্ত

প্রভুদের হাতে ছিল কৃষকদের জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা। সামন্তরা ছিল ছোট ছোট রাজার মত। দেশের রাজা ছিলেন যেন সেসব সামন্তদের মধ্যে প্রধান মাত্র।

সামন্ত প্রভু কর্তৃক সরকারী কর্তৃত্বের বেসরকারী দায়িত্ব গ্রহণ :— সামন্ত প্রভুরা নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য রাজার কাছ থেকে কতকগুলির অধিকারের সনদ আদায় করত। এইগুলির বলে ভূস্বামীদের অধিকারভুক্ত জমিদারী রাজাও রাজকর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকত। ফলে সামন্ত প্রভুরা নিজ নিজ জমিদারীতে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। তাছাড়া, রাজা থাকতেন দূরে। যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় স্থানীয় সরকারী শাসনে রাজ-কর্মচারীদের ভূমিকাও ছিল নিতান্তই সামান্য। এ অবস্থায় রাজারা। স্বেচ্ছায় কিছু কিছু কর্মভার সামন্ত প্রভুদের হাতে তুলে দিতেন। ফলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিচার কার্য সম্পন্ন করা, শুল্ক ধার্য করা এমন কি মুদ্রা ছাপানো প্রভৃতি যেগুলি ছিল রাজার করণীয় কাজ, সেগুলির অধিকাংশেই সামন্ত প্রভুরা নিজেদের হাতে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব ছিল রাজার, তার বেশীর ভাগই সামন্ত প্রভুরা স্থানীয় জনজীবনে প্রয়োগ করতেন। এভাবে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব রাজা বা সরকারী রাজকর্মচারীর বদলে সামন্ত প্রভুদের দ্বারা বেসরকারীভাবে পালিত হতে থাকে। ফলে শাসন ব্যবস্থায় সামন্তদের ভূমিকা হয়ে ওঠে প্রধান, আর রাজার ভূমিকা হয়ে পড়ে অপ্রধান।

জীবনযাত্রার অঙ্গরূপে সামন্ত ব্যবস্থা—সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা ও রাজকর্মচারীদের রাজ্যশাসনে গৌণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় শক্তিশালী নেতারূপে সামন্ত প্রভুদের কাছে সাধারণ মানুষ জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করত। তাই সাধারণ মানুষ সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। এভাবে সামন্ত প্রথা জীবন যাত্রার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। কারণ

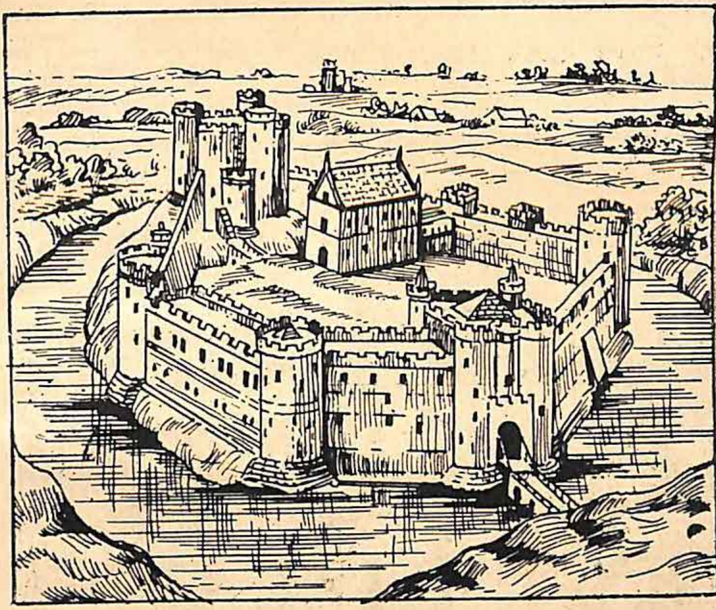
সেযুগের মানুষ সামন্ত ব্যবস্থায় প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রাও বিপদ থেকে মুক্তির সন্ধান পায় ফলে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থারূপে সামন্ত প্রথা জনজীবনে সাদরে স্থান পায়। অবশ্য শক্তিশালী রাজাদের আমলেই শুধু এব্যবস্থা জনজীবনে সুফল এনেছে, দুর্বল রাজাদের আমলে নয়। কারণ দুর্বল রাজাদের আমলে সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচার সীমা ছাড়িয়ে যেত।

ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষায় বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য ও দুর্গের ভূমিকা :

প্রত্যেক সামন্ত প্রভুকে তার উর্ধতন প্রভুর আহ্বানে সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হত। তাছাড়া নিজেদের জমিদারী অন্যান্য সামন্ত প্রভুর আক্রমণ থেকে কিম্বা নর্সম্যানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সামন্ত প্রভুদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হত। ধাতু নির্মিত নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করা হত। পদাতিক বাহিনী ছাড়াও এ অশ্বারোহী বাহিনী সৈন্য-দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগ ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড়াগুলিকেও বর্মে আচ্ছাদিত করা হত। সে যুগে শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সৈন্য বীরত্বে ও ক্ষিপ্রতায় খুব খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের দেশের মত ইউরোপের অনেক দেশে এখনও ভগ্নপ্রায় দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গগুলি ছিল স্বয়ংসম্পুর্ণ। মধ্যযুগে এসব দুর্গে সামন্ত বা জমিদাররা থাকতেন। প্রত্যেক সামন্ত প্রভু নিজ নিজ জমিদারীতে নিরাপদ স্থানে দুর্গ তৈরী করতেন। এগুলো পাথর দিয়ে হত এবং চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। দুর্গের চারিদিকে পরিখা বা খাল কেটে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হত। দুর্গগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের উপর নির্মিত হত। তাতে উঁচু জায়গা হতে যেমন অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত, তেমন শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধেও খুব সুবিধে হত।

ঐ সব দুর্গের পরিখার উপর একটি সেতু থাকত এবং ইচ্ছামত সেতুটি নামানো উঠানো যেত। এদের টানাপুল বলা হত। দুর্গে প্রবেশ করার পথে লোহা কিংবা শক্ত কাঠের অত্যন্ত মজবুত দরজা থাকত! দুর্গের



মধ্যযুগের দুর্গ

মধ্যে উঁচু মিনারে লোক বাস করত। আবার শত্রু আক্রমণ করলে মিনারের জানালা দিয়ে তীর নিক্ষেপের ব্যবস্থাও ছিল। শত্রু খুব কাছে এসে পড়লে উপর থেকে তপ্ত গলিত সীসা শত্রু সৈন্যের উপর ঢেলে দেওয়া হত।

প্রত্যেক দুর্গে অনেক ঘর থাকত যেখানে সামন্ত ও তাঁর আত্মীয় স্বজন বাস করতেন। তাছাড়া প্রচুর সংখ্যক সৈন্য থাকার ব্যবস্থাও সেখানে ছিল। যুদ্ধের সময় সাধারণ লোকেরা দুর্গে বা দুর্গ সংলগ্ন ভূমিতে আশ্রয় নিত। মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের দুর্গগুলি এবং বর্মাবৃত অশ্বারোহী বাহিনী ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করার ব্যাপারে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, পরবর্তী সময়ে ইউরোপের কয়েকটি শহর কোন কোন দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

নাইট ও বীরধর্ম :—সে যুগে সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা লেখাপড়া শেখার চেয়ে যুদ্ধকেই বেশী সম্মান জনক বলে মনে করত। তাই সে সব সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণরা কোন বিখ্যাত যোদ্ধার কাছে ঘোড়ায় চড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখত। যুদ্ধবিদ্যা শেখা শেষ হলে, তাদের 'নাইট' পদবী দেওয়া হত। সৈনিক ব্রতে দীক্ষা উপলক্ষে একটি ধর্মীয়



'নাইট' উপাধি লাভের অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান হত। যে যুবক নাইট হবে, সে পূর্ব রাত্রিতে গীর্জার বেদীমূলে আরাধনা করত। বেদীর উপর থাকত তাঁর ঢাল, তরবারি ও বর্শা। পরদিন সে রাজা বা কোন সামন্তের কাছে অভিবাদন করে তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করত। প্রভু সে তরবারি দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বলতেন "ভগবানের নামে তোমাকে নাইট পদে বরণ করা হল। তুমি যথাযোগ্য সাহস ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিও।" তখন থেকে সে নাইট

বলে পরিচিত হত। এই সময়ে সে কতকগুলি শপথ নিত যেমন :—'ন্যায়ের রক্ষক ও অন্যায়ের শাসক হব, প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকব ; নারী, শিশু ও দুর্বলদের রক্ষা করব ; প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করব না।'

নাইটরা ছিল বীরত্বে ও সৌজন্যে অতুলনীয়। তাঁদের বিভিন্ন গুণাবলীকেই বলা হত **বীরধর্ম** বা **শিভ্যালরি**। বিপদে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করা, সামন্ত প্রভু ও ধর্মের প্রতি বিশ্বস্তা থাকা, নারী ও শিশুদের রক্ষা করা, মার্জিত ও ভদ্র ব্যবহার করা প্রভৃতি বীর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগে যে বর্বরোচিত আচার-ব্যবহার দেখা যেত, নাইটদের বীরধর্মের মহৎ আদর্শ তা অনেকটা দূর করে সভ্যতার অগ্রগতিতে খুব সাহায্য করে।



নাইট

নাইটরা সব সময়ই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। লোহার বর্ম পরিধান করে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা যুদ্ধ করত। তাঁদের মাথায় থাকত লোহার টুপি। কর্তব্যের আহ্বানে বিনা দ্বিধায় তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অবসর সময়ে তাঁরা শিকার কিম্বা **টুর্ণামেণ্ট** নামে একরকম কৃত্রিম বা নকল যুদ্ধে যোগ দিত।

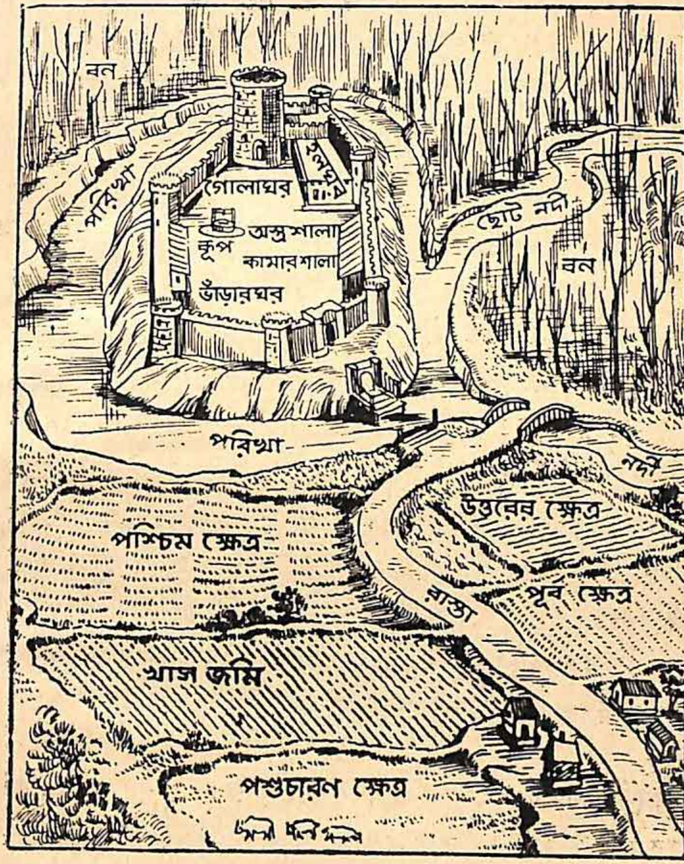
ক্রুবাদুর :—সামন্তযুগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ যুদ্ধ ও বীরত্বের কাহিনী। সেযুগে পণ্ডিতদের ভাষা ছিল ল্যাটিন, যেমন

আমাদের দেশে ছিল সংস্কৃত। সাধারণ লোকের পক্ষে ল্যাটিন বোধগম্য ছিল না। কিন্তু সে সময়ে কয়েকজন বড় বড় লেখক ল্যাটিন ভাষায় না লিখে নিজেদের মাতৃভাষায় সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্য ছাড়াও পুরানো বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে অনেক গাথা লেখা হতো, যেমন ;—রাজা আর্থার ও তার গোলটেবিল, রবিনহুড, শার্লিমেনের সেনাপতি রোল্যাণ্ডের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম প্রভৃতি। তাঁরা জীবনে যেসব দুঃসাহসিক কাজ করেছেন সেগুলিকে নিয়ে রচিত গাঁথা ভ্রাম্যমাণ চারণ কবি ও গায়কেরা গ্রামে, শহরে গেয়ে বেড়াতেন। ফ্রান্সে এরা খুবই বিখ্যাত ছিল। এদের বলা হত **ক্রুবাদুর**। জার্মানিতেও এরকম বীরত্বপূর্ণ গাঁথা অনেক লেখক লিখে গেছেন। চারণ কবিরা সেগুলি ইউরোপের দেশে দেশে গান গেয়ে শোনাতেন। তাদের **মিনেসিঙ্গার** বলা হত ;

সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিকরূপ বা ম্যানর :—সামন্ত যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। এই গ্রামগুলিকে তখন ম্যানর বলা হত। সেখানে অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষক। আবার তাদের মধ্যে একশ্রেণী ছিল স্বাধীন, অপর শ্রেণী ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। অধিবাসীদের জীবন ছিল সংঘবদ্ধ। প্রতি ম্যানারের সর্বময় প্রভু ছিলেন জমিদার বা সামন্ত। গ্রামের জমির খানিকটা ছিল তাঁর সরাসরি দখলে আর বাকীটা ছিল প্রজাদের হাতে। তাঁরা প্রভুকে খেতের ফসল দিত। প্রজারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিজেরাই উৎপন্ন করত। কেহ অভিজাত প্রভু ও সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য জোগাত, কেহ তাঁদের পরিধেয় তৈরী করত। একমাত্র লবণ সংগ্রহ করা ছাড়া ম্যানরের বাইরে তাঁদের যেতে হত না। এভাবে ম্যানরগুলি ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সামন্ত ব্যবস্থার এই অর্থনৈতিক দিকটিকে বলা হয় ম্যানর পদ্ধতি।

সামন্ত সরকারের স্থানীয় ক্ষুদ্রতম অঙ্গ হিসেবে ম্যানর :—সামন্ত প্রভুর অধীনস্থ স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসরা জমিদারের খাস দখলের

জমিতে বেগার খেটে তারপর নিজেদের জমি চাষ-বাস করত। এছাড়াও প্রভুর সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের যোগাতে হত।



ম্যানর বা গ্রামে জমিদার বা সামন্ত প্রভুর খামার বাড়ী

উপরন্তু তারা খাজনা হিসাবে নগদ টাকা বা ফসলের একাংশ প্রভুকে দিতে বাধ্য থাকত। ব্যক্তিগতভাবে এবং জমির জন্য কৃষকরা ম্যানর প্রভুর অধীনতা মেনে চলত। সামন্ত প্রভু উৎপাদন বিষয়ে আদৌ কোন প্রত্যক্ষ অংশ নিতেন না। তাদের কাজ ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা,

অন্যান্য সামন্ত প্রভু ও চোর ডাকাতের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা এবং প্রজাদের অভিযোগের বিচার করা ইত্যাদি।

ম্যানর বা গ্রামের কাছারী—জমিদারের কাছারীতে প্রজাদের বিচার হত। নতুন প্রজাকে জমি হাতে নেওয়ার আগে ভেট দিতে হত। জঙ্গলে শিকার করা, কাঠ কুড়ানো, নদীতে বা পুকুরে মাছ ধরবার স্বাধীনতা চাষীদের ছিল না। কেহ এগুলি অমান্য করলেই তাঁর বিচার হত। এছাড়া গ্রামের কাছারীতে প্রজাদের একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগেরও বিচার হত। কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে, তার জরিমানা হত। সামন্ত প্রভুরা ছিল চাষীদের প্রকৃত শাসক। রাজার সঙ্গে প্রজার সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না। সামন্তরাই ছিল এদের মধ্যে সংযোগ সেতু। রাজসভার অনুকরণে ম্যানর প্রভুরা নিজ নিজ সভা রাখতেন। সে সব সভায় কখনও স্থানীয় রাজকর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা—ম্যানর বা গ্রামের সাধারণ মানুষদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তখন সমাজের বেশীর ভাগ লোকই ছিল কৃষক। স্বাধীন কৃষকদের চাইতে ভূমিদাসদের আর্থিক অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সে সময়ে কৃষকগণ উন্নত কৃষির বিষয়ে তেমন কিছুই জানত না। তাই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও তেমন বেশী হত না। ফলে অনুন্নত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল খুব দুর্বল।

ম্যানর বা গ্রামের কৃষি জীবন—সামন্ত প্রভুর দুর্গের কাছেই বিস্তৃত চাষের জমি থাকত। তার এক অংশে চাষবাস হত সামন্ত প্রভুদের জন্য। সেখানে বসবাস করবার ব্যবস্থাও ছিল। সামন্তরা তাদের অনুচরদের সঙ্গে অনেক সময় সেখানে থাকতেন। জমিদারদের এসব বাড়ীকে বলা হত ম্যানর বা খামার বাড়ী। বাকী জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওরা হত। সামন্ত যুগে কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। কৃষকদের সংখ্যা তাই অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত লোকের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কৃষকদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ

ছিল-স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাস বা সার্ফ। স্বাধীন কৃষক যাঁরা, তাঁদেরও প্রভুর জমি চাষ করতে হত এবং নিজেদের জমির ফসল তাঁরা নিজেরা ভোগ করতে পারত। অবশ্য ফসলের কিছু অংশ খাজনা হিসাবে প্রভুকে দিতে হত। এরা ইচ্ছা করলে এক সামন্ত প্রভুর আশ্রয় ছেড়ে অন্য সামন্ত প্রভুর আশ্রয়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু সার্ফ বা ভূমিদাসরা প্রভুর জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভূমিদাসদের এই ব্যবস্থা ছিল বংশানুক্রমিক। ভূমিদাসরা পুরোপুরি দাস না হলেও এদের উপর শোষণ হত চরম। সে শোষণের প্রধান কথা হল দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে তাদের বেগার খাটিয়ে জমিদারের জমি চাষ করিয়ে নেওয়া।

কৃষকের অতিরিক্ত শ্রম ও করের বোঝা: সামন্ত সমাজের আর্থিক দিকটি হল এই যে, উৎপাদনের প্রায় গোটা ক্ষেত্র জুড়ে ছিল কৃষিকার্য। অসংখ্য ফালি ফালি জমিতে বহু ছোট ছোট চাষী প্রাণ-পাত পরিশ্রম করে অনগ্রসর প্রথায় চাষ করে কোন প্রকারে নিজেদের ভরণ-পোষণ করত। উৎপন্ন দ্রব্যের একটা বড় অংশ জমিদারের হাতে তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য ছিল। কখনও সমমূল্যের টাকা দিয়ে খাজনা পরিশোধ করত। এভাবে সামন্ত প্রথার অর্থ নৈতিক দিকটি ছিল মুষ্টিমেয় শক্তিশালী লোকের দ্বারা এক বিরাট সংখ্যক খেটে খাওয়া মানুষের অর্থ নৈতিক অধীনতা।

কৃষকের অবস্থা—ম্যানর বা গ্রামগুলি ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের আর্থিক যোগ ছিল খুবই কম। চাষের ধরণ অনুন্নত থাকায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ তেমন বেশী হত না। সকলে একত্রে সমস্ত চাষের জমি চাষ করত। ফসল কাটার পর সকলের জমিতে সকলে গরু চরাতে পারত। গ্রামের গোচারণ মাঠেও ছিল সকলের সমান অধিকার।

কৃষক ব্যতীত গ্রামগুলিতে থাকত কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি কারু-শিল্পে নিযুক্ত কিছু লোক। ফলে নানারূপ হাতের কাজ গড়ে উঠেছিল।

চাষের কাজে নিয়োজিত পশুর চামড়া কিংবা পশম থেকে জামা কাপড় প্রস্তুত করা হত। কৃষকদের স্ত্রীলোকরাও সুতো তৈরী করা, কাপড় বোনা, জুতো তৈরী করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকত। গরীব কৃষকদের বাড়ীর দেওয়াল তৈরী হত কাঠ কিংবা পাথর দিয়ে। উপরে থাকত খড়ের চাল। তাদের খাদ্য ছিল রুটি ও সব্জি। গরীব বলে মাছ মাংস বেশী খেতে পেত না। কাঠের কিংবা মাটির বাসন পাত্রে তাঁরা খেতে। তাদের সম্পত্তি বলতে ছিল কয়েকটি শূকর, গাভী ও ষাঁড় আর চাষের কয়েকটি যন্ত্রপাতি। কারও অবস্থা ভাল হলে একটা ঘোড়াও থাকত। এককথায় তাদের জীবন ছিল দারিদ্র ও একঘেয়ে। তবে ধীরে ধীরে কারিগর ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, শহরে প্রস্তুত নানা জিনিসপত্র আশেপাশে গ্রামবাসীরা ক্রয় করত। দ্রব্য বিনিময়ের কেন্দ্ররূপে ছোট ছোট বাজার গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে গ্রামগুলিতে বড় মেলাও বসত।

কারিগরের হাতের কাজ ও সেগুলির বেচাকেনা অনেক দিন পর্যন্ত সামন্ত সমাজের আওতার মধ্যেই ছিল। পুরোহিত ও সামন্ত প্রভু নিজ নিজ এলাকার চাষীদের শোষণ তো করতই, তাছাড়া কাছাকাছি শহরের কারিগরদের ও বণিকদের লাভেও ভাগ বসাতো। মধ্যযুগের সামন্ত অর্থনীতি খানিকটা শিল্পভিত্তিক হলেও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিই ছিল প্রায় সামগ্রীক রূপ।

নগদে বা পণ্যে কৃষকদের দেয় খাজনার বোঝা :—সামন্ত প্রভুরা বাস করত তাদের প্রাসাদ দুর্গে। সেখানে তাঁরা সৈনিক অনুচর, দাসদাসী নিয়ে বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ভোগের জীবন যাপন করত। এ সবের জন্য তাদের কোন কাজ করতে হত না। সবটাই সম্ভব হতো শোষণের মাধ্যমে। দুর্গের ঘরগুলি ছিল কারুকার্য্য করা। মাঝে মাঝে সেখানে বড় বড় ভোজ দেওয়া হত। আমোদ প্রমোদের কোন অভাব ছিল না। গায়ক, বিদূষক, বাজীকর সামন্তপ্রভু ও তাঁর পরিবারের লোকজন ও অতিথিদের আনন্দ দিত।

সামন্ত প্রভুরা বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে কৃষকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাত। এখানেই তারা থেমে থাকে নি। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকেও তাঁরা শোষণের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতেন। মানুষের বিশ্বাস ও বিবেক বুদ্ধির উপর মধ্যযুগে খৃষ্টীয় গীর্জার খুব প্রভাব ছিল। গীর্জার পুরোহিতরা কিছু ভাল কথার সঙ্গে এমন কথাও শিখিয়েছিল যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু ধনী ব্যক্তি থাকবে আর বাকীরা থাকবে দরিদ্র। সে নিয়মেই কিছু ব্যক্তি শাসন করে ও অন্যেরা শাসিত হয়। যারা ঈশ্বরের এসব বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তারা শুধু বিদ্রোহীই নয়, পাপীও বটে। ফলে প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষ কোনরূপ প্রশ্ন না করেই নিজ নিজ প্রভুর জন্য খাদ্য ও বস্ত্র যোগাবার ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। এ পরিশ্রম করত শুধু ভয়ে নয়, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েই। এসব শ্রমজীবি মানুষের অধিকাংশই ছিল কৃষক, যাঁরা কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। গীর্জা যেসব ধর্ম কথা শিক্ষা দিত, তা তাঁরা নির্বিচারে মেনে নিত। এগুলি ছিল শোষণের সামন্ত তান্ত্রিক প্রণালী বা কৌশল। এই কৌশলকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর হাতে ধর্মভয়ে ভীত দরিদ্র জনগণ ছিল এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

সামন্ত প্রভুরা তাদের খাস জমিদারী থেকে কখনও জমি, কখনও অর্থ, ক্যাথলিক গীর্জাকে দান করত। কারণ শোষণের দিক থেকে পুরোহিত ও সামন্ত শ্রেণী উভয়ই ছিল শোষক। সমস্বার্থ উভয়কেই মিত্রে পরিণত করে। যদিও নিজেদের অধিকারের সীমানা নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়াও হত।

তবে সাধারণ লোককে দমন করবার সময় পুরোহিত ও সামন্তরা একে অপরের দোসর রূপে কাজ করত। ফলে পুরোহিতদের ধর্ম-কর্মের কেন্দ্র মঠ গীর্জগুলি ধীরে ধীরে বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। পুরোহিতরাও বড় বড় জমিদারদের মত ধন সম্পদে ফুলে ফেঁপে

উঠতে থাকে। ফলে পুরোহিতদের অনেকেই শাসকশ্রেণীর প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে স্থান পেতে থাকে। বড় বড় মঠের প্রধান বা বিশপরা মর্যাদার দিক থেকে বড় বড় অভিজাতদের (ডিউক) সঙ্গে একই সারির বলে মনে করতেন।

মধ্যযুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল ক্যাথলিক চার্চের ছায়ায়। শিক্ষিত লোকেরা তখন প্রায় সকলেই ছিল পুরোহিত। লেখা পড়ার ভারও ছিল তাদের হাতে। তাই খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব প্রধান বিদ্যা বলে স্থান পায়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই পুরোহিত ছিল বলে শোষক গীর্জার মহিমা বাড়াতে তারা আগ্রহ দেখায়। প্রভুত্ব ও অর্থের লোভে এসব পুরোহিত মানুষের জীবনে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার পরিবর্তে সেগুলিকে আরও প্রশ্রয় দিত—যেমন, ধর্মকর আদায় ছিল একটি।

সামন্ত ব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্য—সামন্ত তান্ত্রিক সমাজে এভাবে তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ভূস্বামী, যাজক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। প্রথম শ্রেণীটি সমাজের সকল ক্ষমতা, অধিকার ও ঐশ্বর্য ভোগ করত। দ্বিতীয়টি মানুষের ধর্মকর্মের নিয়ন্ত্রারূপে সমাজের দানে প্রতিপালিত ও পুষ্ট। তাঁরা ছিলেন ধর্মের সঙ্গেজড়ানোএকশ্রেণী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক নানা কাজকর্মে অংশ গ্রহণকরে এরাহয়ে ওঠে বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। এ ভাবে ভূ-স্বামীদের মত তারাও অত্যন্ত প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ। বঞ্চনার সবচেয়ে দুঃখজনক জীবন ছিল সার্ফ বা ভূমিদাসদের। এদের মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। প্রভুর জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ারও অধিকার ছিল না। তাছাড়া ছিল কতকগুলি অমর্যাদাকর বিধি বিষেধ। সামন্ত প্রভুর মতামত ছাড়া ভূমিদাস তাঁর ষাঁড়, বলদ কিম্বা ঘোড়া বিক্রি করতে পারত না। এমনকি তাঁর নিজ কন্যার বিবাহ দিতে হলেও আগে প্রভুর সম্মতি নিতে হত।

ভূমিদাসরা প্রভুর যন্ত্রপাত্রি ও উৎপাদনের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে তাঁর খাস জমি চাষ করত। তারপর তাদের শ্রমের সমগ্র ফসল প্রভুদের হাতে তুলে দিত। বিনিময়ে প্রভু থেকে পাওয়া দুই এক ফালি জমি চাষআবাদ করে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য একেবারে না হলে নয়, এরকম প্রয়োজনটুকু মেটাতো।

সামন্ত প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তিরূপে ভূমিদাস—ভূমিদাসদের পীড়নের আর্থিক রূপ ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ত প্রভুর কাছে ভূমিদাস ছিল নিজে অধীন, তার ভূমি ছিল অধীন এবং স্থানীয় আইন ও শাসন ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসাবে জমিদারের অধীন। জমির মালিকানা বদলালে অন্যান্য জিনিসের মত এরাও নতুন প্রভুর সম্পত্তিতে পরিণত হত।

সামন্ত শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থ—এভাবে সামন্তশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হওয়াতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শত্রুতামূলক। ভূমিদাস যখন তার নিজের জমিতে কাজ করত তখন অন্তরের সঙ্গে ফসল ফলাবার চেষ্টা করত। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন সামন্ত প্রভুর জমিতে বেগার খাটতে হত। তা না করলে মারধোর ও নানারূপ কঠোর শাস্তি এমনকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিত। জমিদারের কাজকে তারা ঘৃণা করত ও যতদূর সম্ভব কম কাজ করত। তবুও কাজ করা যখন বাধ্যতামূলক ছিল তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রভুর জলবাহী পশুগুলিকে খোড়া করে দিত ও যন্ত্রপাতি ভেঙে দিত।

মুক্তির পথ—ভূমিদাসদের অমানুষিক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার অবশ্য কয়েকটি উপায় ছিল। একটি ছিল ধর্মীয় সংস্থায় যোগ দেওয়া। এছাড়া ধর্মযুদ্ধে যোগ দিলেও তারা স্বাধীন প্রজার মর্যাদা পেত। ইহা সম্ভব হয়েছিল সে সময়ে খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে। দ্বিতীয় উপায়টি ছিল নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলিতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এসময়ে অনেক শহর গড়ে

উঠেছিল শহরগুলি স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত। এখানে সামন্ত ব্যবস্থার প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। এসব শহরে স্বাধীন ব্যবসা করে বা নানাশিল্পে কাজ করে জীবনধারণ করা সহজ ছিল। সেইজন্য ভূমিদাসরা অনেকেই পালিয়ে গিয়ে শহরগুলিতে আশ্রয় নিত। তাছাড়া, শহরে একবছর ও একদিন বাস করতে পারলেই ভূমিদাস দাসত্ব হতে মুক্তি পেত।

দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কখনও কখনও চেষ্টা হত প্রকাশ্য গণ প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এইভাবে কৃষক আন্দোলনে কেঁপে ওঠে। **চতুর্দশ শতকে ইংল্যাণ্ডের ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের ফ্রান্সের জ্যাকারী বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য।**

অনুশীলনী

বিশেষ করে মনে রাখতে ঃ

রোম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় যে নতুন রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে কোন একতা ছিলনা। রাজারাও তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ ও রাজ্যের ভেতরে বিশৃঙ্খলার ফলে জনজীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। এ অবস্থায় রাজা প্রভাবশালী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের বড় বড় ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার ছেড়ে দেন। রাজা বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে আনুগত্য ও খাজনা পেতেন। এই জমি যাঁরা রাজার কাছ থেকে পেলেন তাঁদের বলা হত সামান্ত— অনেকটা আমাদের দেশের জমিদার বা জায়গীরদারদের মত। বড় সামন্ত আবার ছোট সামন্তকে এবং সর্বশেষে ছোট সামন্ত কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দিতেন। জমি বিলির বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে যে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই বলে সামন্ত প্রথা।

২। সামন্ত প্রথা আগের বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিবর্তে জনজীবনে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে। জনগণের মনে এই নতুন ব্যবস্থা একটা স্থান করে নেয়। কারণ সাধারণ মানুষ এ ব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে খানিকটা ভরসা পায়।

৪। রাজার বা সামন্তদের সঙ্গে থাকত একদল বীর যোদ্ধা। এদের বলা হত নাইট। তাদের বীরত্বপূর্ণ আচরণকে বলা হত বীরধর্ম বা বা শিভ্যালরি।

৫। সামন্তপ্রথার অর্থনৈতিক দিকটিকে বলা হত ম্যানর পদ্ধতি। ম্যানর বা গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষকদের শস্য উৎপাদনে জমি বিলি বন্দোবস্তই ছিল সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

৬। সামন্ত সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ভূস্বামী, যাজক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিল যাজকগণ। তারা গীর্জার মহিমার আড়ালে প্রথম শ্রেণীভূক্ত সামন্তপ্রভুর দোসররূপে সাধারণ মানুষদের শোষণ করত।

৭। শেষের শ্রেণীভূক্ত অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষক। কিছু অবশ্য ছিল হাতের কাজে নিযুক্ত কারিগর। কৃষকদের মধ্যে আবার ভূমিদাস বা সার্ফদের জীবন ছিল আমানুষিক দুঃখ ও লাঞ্ছনায় ভরা।

৮। তাঁদের নির্যাতন প্রতিরোধে স্থানে স্থানে কৃষকদের বিদ্রোহ দেখা দেয়।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

কৃষিভিত্তিক সমাজে উৎপাদনের প্রধান উপাদন কি? সামন্ত কাদের বলা হত? মধ্যযুগে দুর্গগুলি সাধারণতঃ কোথায় নির্মিত হত? 'নাইট' বলতে কি বুঝ? মধ্যযুগে সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু কি ছিল? 'ত্রুবাদুর কাদের বলা হত? 'ম্যানর' কথাটির অর্থ কি? সামন্ত ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণী কি কি ছিল? ভূমিদাস কাদের বলা হত? ওয়াট টাইলার কোথাকার লোক ছিলেন? জ্যাকেরী বিদ্রোহ কোথায় হয়েছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

মধ্যযুগে ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল—। সামন্তরা ছিল ছোট ছোট— মত। যে যুবক—হবে, সে পূর্বরাত্রিতে গীর্জায়—আরাধনা করত। বেদীর উপর ছিল—। পরের দিন কোন—তাঁকে—বরণ করত। সামন্ত প্রভুরা বাস করত তাদের—। মধ্যযুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল ক্যাথলিক—ছায়ায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তিনটি—গড়ে উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ ঃ

(ক) সামন্ত প্রভু রাজার হয়ে কি কি কাজ করতেন ?

(খ) সামন্তদের দুর্গ সাধারণতঃ কিভাবে নির্মিত হত -

(গ) সামন্তপ্রথা কিভাবে সে যুগের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতো ?

(ঘ) কোন যুবক নাইট উপাধি কি করে লাভ করতো ?

(ঙ) নাইটদের করণীয় কর্তব্য কি কি ছিল ?

(চ) সাধারণ মানুষ সামন্ত শ্রেণীর আশ্রয়ে বসবাস করত কেন ?

(ছ) মধ্যযুগে ইউরোপে জমির বিলি বন্দোবস্ত কেমন ছিল তা আমাদের দেশের অবস্থা উল্লেখ করে আলোচনা কর।

(জ) মধ্যযুগে সামন্ত ব্যবস্থায় কৃষক বিদ্রোহ কেন দেখা দিত ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সামন্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

১। (ক) সামন্তপ্রভুর নির্যাতন সত্বেও সে যুগের সাধারণ মানুষ তার আশ্রয়ে কেন বাস করত ?

(খ) মধ্যযুগের কৃষক ও গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

টীকালিখ ঃ

(ক) ত্রুবাদুর ; (খ) মিনিসিঙ্গার ; (গ) টুর্ণামেন্ট ; (ঘ) ম্যানর ; স্পর্ফ ;

করণীয় কাজ ঃ

(ক) বর্মাবৃত একটি অশ্বারোহী সৈনিকের ছবি এঁকে দিদিমণি বা মাষ্টারমশাইকে দেখিয়ে তা কতটা ঠিক হয়েছে জেনে নেবে।

(খ) "বর্মধারী অশ্বারোহীরাই এক সময় ইউরোপকে বাঁচিয়ে ছিলেন"—এই কথাটির তাৎপর্য দশ লাইনে বাড়ী থেকে লিখে আনবে।

ক্রুসেড

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ: আজ থেকে প্রায় নয়শো বছর আগে মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খৃষ্টানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ বাধে তুর্কি-মুসলমান ও ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মধ্যে। ধর্মস্থান অধিকারে যাওয়ার সময় খৃষ্টান সৈন্যরা বুকে ক্রুশ বাঁধতেন। ক্রুশ খৃষ্টানদের ধর্মের চিহ্ন। ধর্মস্থান অধিকারের যুদ্ধই ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্রুসেড। এই যুদ্ধ মাঝে মাঝে, থেমে থেমে প্রায় দুশো বছর ধরে চলে। মোট আটটি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য: এই যুদ্ধের পেছনে ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য। ধর্মের দিক থেকে উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টানধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলা এবং রোমীয় চার্চের প্রাধান্য পূর্ব-ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক দিকে থেকে উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান রাজাদের প্রাচ্যদেশে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সামন্ত সন্তানদের ঐসব স্থানে জমিদারী গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। অর্থনৈতিক দিক থেকে উদ্দেশ্য ছিল ইটালীর বাণিজ্য নগরীসমূহের পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা-বানিজ্যে সুবিধা লাভ। এছাড়া বহু ভূমিদাস ও অপরাধী ঋণ ও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে ধর্মযুদ্ধে মেতে উঠেছিল। সর্বশেষে ধর্মস্থান উদ্ধারে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ হবে এমন বিশ্বাসও অনেককে এই যুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ধর্মযুদ্ধের সূত্রপাত—সন্ন্যাসী পিটার:

পশ্চিম এশিয়ার প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত জেরুজালেম শহর হল খৃষ্টানধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—যীশুর পবিত্র সমাধিস্থান। এখানে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান নরনারী তীর্থ করতে আসতেন। একাদশ শতাব্দীতে তুর্কী-অধিকৃত এই শহরে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। এই অত্যাচারের কথা পিটার নামে এক ধর্মপ্রাণ

খৃষ্টান সন্ন্যাসী ইউরোপের শহরে শহরে ঘুরে রাজা, প্রজা সকলের নিকট জ্বালাময়ী ভাষায় বলতে থাকেন। ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানও সমস্ত খৃষ্টানদের যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানান। পিটারের প্রচার ও পোপের আবেদনের ফলে ইউরোপে খুব সাড়া জাগে। ফলে কয়েক হাজার ধর্মান্ধ মানুষ পিটারের নেতৃত্বে জেরুজালেম উদ্ধারে অভিযান করেন। এই অভিযান সংগঠিত ছিল না। অভিযানকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিল দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত। যাত্রাপথের ধারে কাছের গ্রাম-গুলিতে অনেকেই লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করাতে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। ফলে অনেকে প্রাণ হারায়। অনাহারেও অনেকে পথে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করে যারা প্যালেষ্টাইনে যেয়ে পৌঁছাল, তারাও তুর্কীদের আক্রমণে নিহত হল। ফলে এই অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

প্রথম ধর্মযুদ্ধঃ এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় কুড়ি হাজার খৃষ্টান সৈন্য জেরুজালেম ঘিরে ফেলে। এই অভিযান ছিল সুসংগঠিত। প্রায় দুমাস লড়াই করে শহরটি ধর্মযোদ্ধাদের দখলে আসে। গডফ্রে নামে এক বীর সামন্ত ধর্মযোদ্ধা জেরুজালেমের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। এভাবে প্রথম ধর্মযুদ্ধে খৃষ্টানদের জয় হল।

কিন্তু এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি! প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তুর্কীদের সঙ্গে খৃষ্টানদের জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে আবার বিবাদ শুরু হয়। ফলে **দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ** বাধে। কিন্তু প্রথম বারের মত এবারে খ্রীষ্টানদের কোন সুবিধে হয়নি।

দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের প্রায় চল্লিশ বছর পরে, (১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) মুসলমানরা সালাদিন নামে এক বীর সুলতানের নেতৃত্বে জেরুজালেম অধিকার করে নেয়; **জেরুজালেম পুনঃ উদ্ধারের জন্য এই সময়ের অভিযানকে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ** বলা হয়। এবারে অনেক বড় বড় রাজা—ইংলণ্ডের রিচার্ড, ফ্রান্সের ফিলিপ ও জার্মানীর ফ্রেডারিক বারবারোসা, প্রভৃতি

ধর্মযুদ্ধে যোগ দেন। বারবারোসার অর্থ লাল রঙের দাড়ি। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড শক্তিতেও সাহসে খুব নামকরা ছিলেন। এজন্য তাঁকে সিংহ-হৃদয় বলা হত।

তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ প্রথম থেকেই খ্রীষ্টানদের পক্ষে শুভ হয় নি। ফ্রেডারিক জলে ডুবে মারা গেলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদের মনোমালিন্য থেকে ফিলিপ, রিচার্ডের উপর রাগ করে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। বহু নাইট ও রিচার্ড যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। রিচার্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তুর্কী সম্রাট সালাদিনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। অবশেষে উভয়ের মধ্যে এক আপোষ হল। তাতে স্থির হল, খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রী বিনা বাধায় জেরুজালেমে যেতে পারবে।

বিরাট আয়াজন সত্বেও একতার অভাবে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানগণ সাফল্য লাভ করেনি। তুর্কী সুলতান সালাদিনের শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শন এ যুদ্ধকে এক অপরূপ মর্যাদা দিয়েছে। যুদ্ধের সময় রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে, সালাদিন তাঁকে ফলমূল এবং বরফ পাঠিয়ে ছিলেন।

এরপর **চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ** শুরু হয় ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্মযোদ্ধারা এবারে পবিত্রভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের বদলে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে দখল করে। ইউরোপের পশ্চিমের খ্রীষ্টানরা অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিকরা পূর্বের খ্রীষ্টান অর্থাৎ গ্রীক খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে। এবারের যোদ্ধারা ছিল হীন প্রবৃত্তির। ধর্মবোধ জলাঞ্জলী দিয়ে তাঁরা লুঠপাঠ প্রভৃতি ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ একটি দুঃখকর ঘটনায় পরিসমাপ্তি লাভ করে।

এরপর আরও চারবার ইউরোপীয় রাজারা ধর্মযুদ্ধে গিয়েছিলেন। প্রায় দু'শো বছর থেমে থেমে চলার পর, শেষ পর্যন্ত ক্রুসেড বন্ধ হল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে। অসংখ্য লোকের জীবন নাশ ও প্রচুর অর্থব্যয় সত্বেও তুর্কীদের কাছ থেকে 'পবিত্র ভূমি' উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ধর্মযুদ্ধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য যা ছিল সে দিক থেকে দেখলে, একমাত্র প্রথমটি ছাড়া অন্য সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছিল।

ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব :— উদ্দেশ্যের দিক থেকে, ইউরোপের খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধগুলি সফল না হলেও, এগুলির ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধগুলিই ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার সভ্যতার পরিচয় ঘটায়। এসব যুদ্ধগুলির মাধ্যমে প্রাচ্যের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতা বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে, ধর্ম্মযুদ্ধের ফলে সামন্ত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী বহু সামন্ত প্রভু নিহত হয়েছিলেন অথবা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। নির্ধাতিত ভূমিদাসরা ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে স্বাধীন জীবন পায়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। তার বদলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের ফলে নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলির অধিবাসীরাও তাদের বুদ্ধির জোরে ও অর্থের দাপটে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। সমাজে এদের পরিচয় হয় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'।

এই যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যের মানুষের আচার-আচরণ ও তাদের ব্যবহৃত নানাবিধ শৌখীন জিনিসপত্র, ইউরোপের লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যেমন,— ঔষধ, রেশম, চিনি, নানারকম মশলা ও সুগন্ধীদ্রব্য, ভারতীয় মনিমুক্তা, চীনে মাটির বাসন, সোফা ইত্যাদি। টাট্টু ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতির ব্যবহার ও ইউরোপ প্রাচ্য দেশ থেকে শেখে। প্রাচ্যের উন্নততর সভ্যতা ও বিলাসসম্ভার ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ইউরোপ প্রাচ্যদেশ থেকে পিছিয়ে ছিল। ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ইউরোপ প্রাচ্যের বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতিবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, নৃতত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেককিছু জানবার ও শেখবার সুযোগ পেল। ইতিহাস

এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ও ধর্মযুদ্ধগুলি নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে এসব অভিযানের ফলে, ইউরোপের মানুষের চিন্তা ও চেতনার দিগন্ত প্রসারিত হল।

ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে নতুন নতুন শহরের উৎপত্তিঃ ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ গড়ে ওঠে। এই সংযোগের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ধর্মযোদ্ধারা ইতালির বিভিন্ন বন্দর থেকে জাহাজে করে জেরুজালেম যেত। এর ফলে ইতালির কয়েকটি রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ-শক্তিরদ্রুত উন্নতি হয়। বানিজ্য-কেন্দ্ররূপ একাধিক সমৃদ্ধ শহর গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, নেপলস, মিলান ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক দিক থেকে এই নগরগুলি ছিল পশ্চিম ইউরোপে পূর্ব দিগন্তের আলো প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে টাকা, পয়সা লেনদেন থেকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও গড়ে গঠে।

কৃষিকর্ম থেকে হস্তশিল্পের বিচ্ছিন্নকরণ :—ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে প্রাচ্যের উন্নততর ভূমিকর্ষণ ও হস্তশিল্পের কারিগরী দক্ষতা ইউরোপের মানুষদের খুব প্রভাবিত করে। কৃষিজাত সামগ্রী ছাড়াও, বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ফলে অনেক কৃষক চাষের কাজের পাশে হাতের কাজের তৈরী নানা সামগ্রী উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। তারা ক্রমশঃ কর্মকার, তন্তুবায়, দরজী ও চর্মকার প্রভৃতির কাজে কৃষিকর্ম অপেক্ষা বেশী সময় দিতে থাকে। তারা প্রায়ই গ্রাম ছেড়ে এমন সব জায়গায় বসতি গড়ত যেখনে তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। এভাবে ইউরোপের মানুষদের প্রধানতঃ কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে কুটির শিল্পের প্রবর্তন হয় এবং কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে একটি সুস্পৃষ্টু বিভাজন রেখার সৃষ্টি হয়। ফলে, গ্রামীন জীবনযাত্রা থেকে নাগরিক জীবনযাত্রা আলাদা হয়ে যায়।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :

১। প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেম শহরে যীশুর সমাধিস্থান তুর্কীদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টানদের যে বারংবার অভিযান চলে তাকেই বলে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

২। সন্ন্যাসী পিটারের জ্বালাময়ী ভাষণ ও পোপের আহ্বানে ইউরোপের অনেক রাজা, সামান্তপ্রভু, ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান জনসাধারণ বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

৩। প্রথম ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্য সফল হলেও দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হয়। তৃতীয় অভিযানে একটি আপোষ মিমাংসা হয়। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ও পরবর্তী চারটি অভিযানও ব্যর্থ হয়।

৪। ব্যর্থ হলেও ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটে। উন্নততর প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লাগে ইউরোপে। ফলে ইউরোপের নবজাগরণের উৎপত্তি ও বিকাশে এই ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব কম ছিল না।

(৫) ইউরোপের শিল্পী কারিগরেরা শিল্পদ্রব্যের বেশী চাহিদা থেকে তাঁদের আর কৃষির সঙ্গে সংযোগ রইল না। আবার শহরের খাদ্যদ্রব্য যোগানের জন্য কৃষক ও বেশী ফসল ফলাতেই সচেষ্ট হল। এইভাবে কুটীর শিল্প এবং কৃষিকাজ একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও :—ধর্মযুদ্ধ কা'কে বলে? (খ) মোট কয়টি ধর্মযুদ্ধ হয়েছে এবং কত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে? (গ) কত খৃষ্টাব্দে প্রথম ধর্মযুদ্ধ বাধে? (ঘ) প্রথম ধর্মযুদ্ধের পর জেরুজালেমের শাসনকর্তারূপে কাকে নিযুক্ত করা হয়? (ঙ) তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে ইউরোপের কোন কোন্ রাজা যোগ দেন? (চ) বারবারোসা কথাটির অর্থ কি? (ছ) এসময়ে তুর্কী সুলতান কে ছিলেন?

করণীয় কাজ

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে যে অভিযান জেরুজালেম উদ্ধারে পাঠানো হয় তার সম্ভাব্য পথ ভেবে ইউরোপের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে তীর চিহ্নিত কর।

নবম অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপের নগর বা শহর

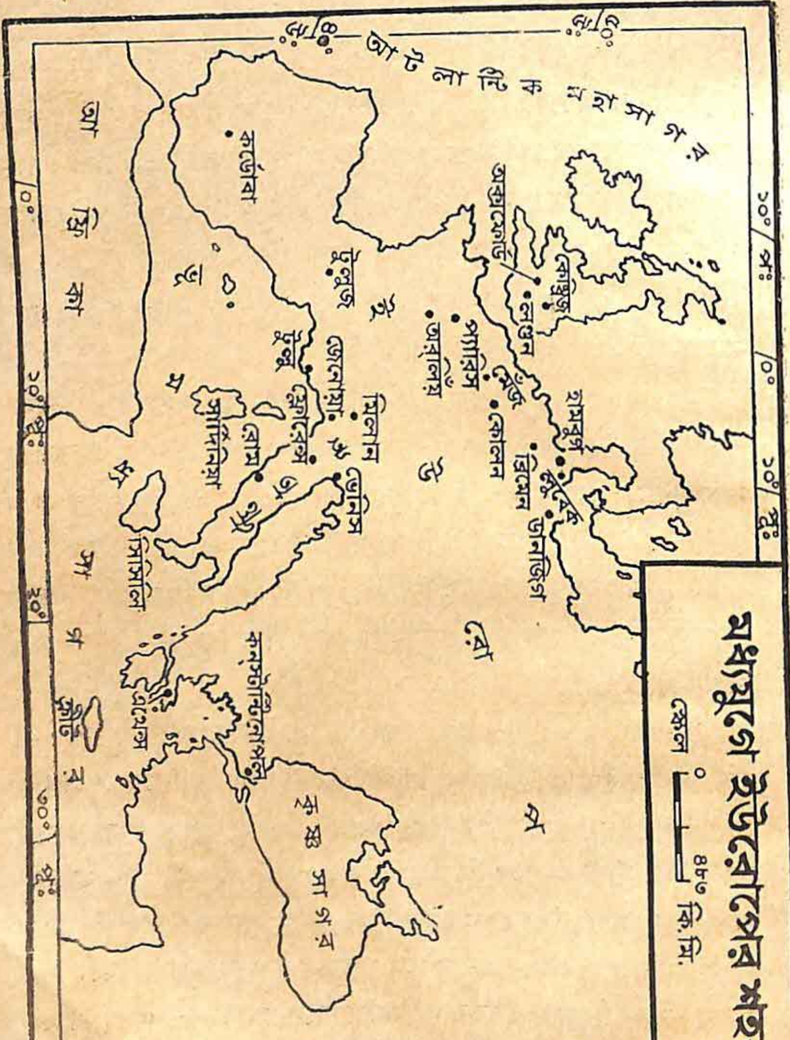
শহর বা নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ—মানব সভ্যতার এগিয়ে চলার পথে শহর বা নগর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রাচীন এথেন্স বা রোমের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে। রোমের পতনের পর থেকে প্রায় পাঁচশো বছর পশ্চিম ইউরোপে কোন বড় শহর গড়ে ওঠেনি। দশম শতাব্দীর পর থেকে নানাভাবে ইউরোপে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে।

মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুর দুর্গ কিম্বা মঠ গীর্জাকে কেন্দ্র করে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া পণ্য-দ্রব্য বেচাকেনার কেন্দ্ররূপে নাব্য নদীর ধারে গঞ্জে বা বড় বড় রাস্তার মোড়ে কিছুকিছু শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের উপরও নতুন শহরের পত্তন হয় (কনস্টাণ্টিনোপল)। এমন কি বিদ্যাচর্চার উচ্চতম কেন্দ্ররূপে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে নতুন শহর গড়ে ওঠে (কেম্ব্রিজ)।

প্রথম দিকে এই শহরগুলি এখনকার বড় গ্রামের চেয়ে সামান্য বড় হত। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর বাইরের শহরগুলি অধিকাংশই ছিল বেশ ছোট। কেবলমাত্র কোলন, মেইন, রীমস, লণ্ডন, ব্রিষ্টল এবং নরউইচ শহর ছিল আকৃতিতে একটু বড়। বাইরের জগতের সঙ্গে এসব শহরগুলির যোগাযোগছিল খুবই সামান্য। প্রথম দিকে অধিবাসীদের শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রীই এসব শহরগুলিতে তৈরী হত। ক্রমশঃ তারা নিজেদের অত্যাবশ্যক কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশী গ্রামগুলির কৃষকদের সঙ্গে নিজেদের তৈরী পণ্যদ্রব্যের বিনিময় করতে শুরু করে। ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে গিয়ে শহরের সম্প্রসারণ ঘটে।

শহরগুলির সমৃদ্ধিলাভে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ভূমিকা :

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে অভিযানগুলির ফলে রোপের ইউবণিকরা



প্রাচ্য দেশগুলির শৌখীন ওমনোহারী দ্রব্য শহরে আনতে শুরু করে। নগরের অধিবাসীরা সেগুলি বিনিময়ে পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য

তৈরী করতে থাকে। এরূপে ধর্মযুদ্ধের প্রভাবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির ফলে শহরগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

ধর্মযুদ্ধে যেসব ভূমিদাস যোগ দিয়েছিল তাঁরা অনেকে ফিরে এসে স্বাধীন ভাবে শহরে নানা দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে। উৎপাদিত সামগ্রীর প্রাচুর্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ধর্মযুদ্ধ-গুলির জন্য জাহাজের চাহিদা থেকে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে উন্নতি ঘটে। ফলে এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ইউরোপে আমদানী হতে থাকে।

ধর্মযুদ্ধগুলি ইউরোপের বিভিন্নদেশে প্রাচ্যের চিনি, তূলো, সিল্ক, সূতিবস্ত্র, কম্বল, মাটির পাত্র, কাঁচের পাত্র, মশলা, ঔষধ প্রভৃতির বিরাট চাহিদা সৃষ্টি করে। ইউরোপের বিভিন্ন শহর, বিশেষ করে ইটালীর শহরগুলি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করে ধনী হয়ে ওঠে।

ধর্মযুদ্ধগুলি সর্বপ্রথম খ্রীষ্টানদের ইউরোপের বাইরে যাওয়ার পথ করে দিয়ে সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে উন্নত দেশগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। বার্সেলোনা ও দক্ষিন ফ্রান্সের শহরগুলি উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইটালীর শহরগুলিতে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আলেকজান্দ্রিয়া, ও কনস্টান্টিনোপল থেকে বহু মূল্যবান সামগ্রী আসতে থাকে। সেখান থেকে আবার অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী মধ্য ইউরোপে চালান হতে থাকে। এভাবে ধর্মযুদ্ধগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়ে ইউরোপে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠতে ও সেগুলির সমৃদ্ধি লাভে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

শহর বাসীর জীবন ঃ—মধ্যযুগের শহরগুলি ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। কারণ চোর-ডাকাত বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা তখন বেশ ছিল। সন্ধ্যা হলেই প্রহরীরা শহরের বাইরে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে দিত।

শহরের পথঘাট ছিল খুব সরু। কোন কোন রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো হত। পথের পাশেই ছিল খোলা নর্দমা। নর্দমায় জমে থাকা

আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ পথিকদের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করত। রাতে শহরের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও চোর-ডাকাতের উৎপাতে খুন-জখম প্রায়ই ঘটতো। চৌকিদাররা সন্ধ্যার পর পাহারা দিত।

শহরে নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ও ছিল। পাখীর লড়াই, ভালুক ও কুকুরের লড়াই দেখতে অনেক লোকের জমায়েত হত। গায়ক এবং বাজীকররাও শহরবাসীকে গান শুনিয়ে ও খেলা দেখিয়ে আনন্দ দিত।

রাজার সনদের দ্বারা শহরে স্বায়ত্ত শাসন ঃ—

ধর্মযুদ্ধে টাকাকড়ির অভাব মেটাতে রাজা বা সামন্ত প্রভু অর্থবান শহরবাসীর কছে হাত পাততো। শহর বাসীও সুযোগ বুঝে অর্থের বদলে রাজার কাছ থেকে কতকগুলি অধিকারের সনদ আদায় করে। সে সব সনদের চুক্তি অনুসারে শহরবাসী নিজেদের পছন্দ মত আইন কানুন এমন কি মুদ্রা প্রচলনের স্বাধীনতা লাভ করে। এভাবে শহর বাসীরা নিজেরাই নিজেদের শাসন করার বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, **"শহরের বাতাস মানুষকে স্বাধীন করে"**—এই প্রবাদ বাক্যটি সেকালে অকারণে বলা হত না।

শহরে গিল্ড (সংঘ বা সমিতি)-এরকার্যাবলী ঃ—

যে সব শহর সামন্ত প্রভুদের জমিদারীর এলাকার মধ্যে গড়ে উঠেছিল, সে সব শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করে তাঁরা বণিকদের হয়রানি করত। জমিদারদের এ জুলুম বন্ধ করতে ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উপায়রূপে বণিকরা একত্রে মিলে সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলে। এগুলিকেই বলা হত গিল্ড। বণিকমাত্রই এসব সংঘের সদস্য হতে পারত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে কারিগরী শিল্পের প্রসার হতে, সে সব কাজে নিযুক্ত লোকদের (তাঁতি, ছুতোর মুচি, কামার প্রভৃতি) নিয়ে আলাদা আলাদা গিল্ড গড়ে উঠে।

এসব গিল্ড বা সংঘ-সমিতিগুলির সভ্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। প্রত্যেক গিল্ডের সদস্যরা বিপদে আপদে একে অপরের সহায় হত। এগুলি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ব্যবস্থারও তদারকী করত। কোনসভ্য গিল্ডের নিয়ম ভঙ্গ করলে তার জরিমানা হত।

বুর্জোয়া ঃ—

'বুর্জোয়া' কথাটি একটি ফরাসী শব্দ। নগরের অধিবাসী অর্থে কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। আগে নগরকে বলা হত 'বুর্'। এই 'বুর্' বা নগরের অধিবাসীরা বুর্জোয়া বলে অভিহিত।

মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পের উন্নতির ফলে বণিক এবং ওস্তাদ বা ক্ষুদে শিল্পপতিরা সামাজিক সম্পদের অধিকারী হয়ে ধনবান হয়ে ওঠে। সমাজে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বিত্তশালী শহরবাসী বুর্জোয়া বলে অভিহিত। এরাই সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদে নির্যাতিত মানুষ, লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে ফাটল ধরায় জমাট বাধা সামন্তসমাজে। ফলে সামন্ত অর্থনীতির বদলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব হয়।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে ঃ

১। মধ্যযুগে দুর্গ, মঠ-গীর্জা, নাব্য নদীর ধারে গঞ্জ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগর কিংবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে।

২। ধর্মযুদ্ধের ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

৩। মধ্যযুগে প্রাচীরবেষ্টিত শহরগুলিতে সরু রাস্তা, খোলা নর্দমা, এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে একতা ছিল। নানা অসুবিধার মধ্যেও আনন্দের উপকরণের অভাব ছিল না।

৪। অর্থের বিনিময়ে শহরবাসীরা জমিদারদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে এবং অনুরূপভাবে রাজার কাছ থেকে সনদের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন লাভ করে।

৫। শহরবাসী বণিক ও কারিগরদের স্বার্থ রক্ষা করত তাদের প্রতিষ্ঠিত গিল্ড বা সংঘ-সমিতিগুলি।

৬। বুর্জোয়া কথাটি একটি ফরাসী শব্দ। ইহার অর্থ নগরবাসী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির ফলে তাঁরা বিত্তশালী হয়ে ওঠে। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব হয়। বর্ধিষ্ণু নগরবাসী বুর্জোয়া নামে অভিহিত।

করণীয় কাজ ঃ

মধ্যযুগে ইউরোপে বিভিন্নভাবে যে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল তার প্রত্যেকটির ছবি এঁকে এক-একটি ছবির নীচে সেগুলির গুরুত্ব দুলাইন করে লিখে দিদিমণি বা মাষ্টার মহাশয়কে দেখাবে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) মধ্যযুগে কখন থেকে ইউরোপে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে? (খ ইটালীর বাইরে যে একটু বড় কতকগুলি শহর গড়ে ওঠে, সেগুলির নাম কি? (গ) ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাচ্যের কি কি জিনিষের চাহিদা সৃষ্টি করে? (ঘ) গিল্ড বলতে কি বুঝ? (ঙ) স্বায়ত্বশাসন বলতে কি বুঝ?

আত্মসমীক্ষা

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ

(ক) মধ্যধুগে কিভাবে নতুন শহরের উৎপত্তি হয়েছিল? (খ) ধর্মধুদ্ধে যোগ দিয়ে ভূমিদাসদের কি সুবিধে হয়েছিল? (গ) ইটালীর শহরগুলির নাম কি কি এবং কেন সেগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে? (ঘ) শহরবাসীরা কেন গিল্ড বা বণিক সংঘ গড়ে তোলে? (ঙ) গিল্ড বা সংঘ কি কি কাজ করত?

পূর্ণাঙ্গ উত্তর লেখ ঃ

"শহরের বাতাস মানুষকে স্বাধীন করে"—মধ্যযুগের এই প্রবাদ বাক্যটির যথার্থতা আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য

(ক) মধ্যযুগে চীন

আরব দেশে যখন ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়, সে সময়ে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) এবং দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৬৪২ খ্রীঃ) রাজত্ব করছেন। ঠিক এই সময়ে দূর প্রাচ্য অর্থাৎ পূর্ব এশিয়ার বিরাট দেশ চীনে তাং নামে, গৌরবেউজ্বল, এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

হান বংশের পতনের পর প্রায় চার শতাব্দী সময় ধরে চীনে বিভিন্ন দুর্বল রাজবংশের আমলে হানাহানি চলে। তার পরে আসে সুই বংশের রাজত্ব (৫৮৯-৬১৮ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় সুই সম্রাট কোয়াং-এর সেনাপতি লি-উয়ান এরপর সাম্রাজ্যের অধিপতি হন!

তাং-যুগ (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ):— তাং-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম লি-উয়ান। তাঁর যশস্বী পুত্র লিসি-মিন সম্রাট তাইসুং নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ (৬২৭-৬৫০ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর মত প্রতিভাবন সম্রাট চীনের ইতিহাসে আর নেই বললেই চলে।

তাং যুগে সাম্রাজ্যের ঐক্য সাধন ঃ—তাই-সুং ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও দিগ্বীজয়ী বীর। তিনি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে এবং যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতি করে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি তাতারদের পরাজিত করে তাদের বিশাল রাজ্য অধিকার করেন। সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশও চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ যুগের অপর এক সম্রাট সুয়ান সুং-এর সময় সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি পায়। তাং সম্রাটদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য আয়তনে বা জন-সংখ্যায় ছিল সে কালের পৃথিবীতে বৃহত্তম। তাং-সম্রাটদের আমলেই চীন মহাচীনের আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে।

চীনে তাং-বংশের শাসনকালকে (৬১৮–৯০৭ খ্রীঃ) ভারতের গুপ্ত যুগের মত স্বর্ণময় যুগ বলা হয়ে থাকে। শিক্ষাদীক্ষায়, সাহিত্যে শিল্পে, চিত্রকলায়, ব্যবসা বাণিজ্যে, কৃষি কর্মে ও ধর্মে চীনারা যে দক্ষতা দেখিয়েছিল তা সে সময়কার পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।



তাই সুং

তাং যুগে পুরানো আইনের সংস্কার :— এই সময়ে নানা প্রশাসনিক ও সামাজিক আইন কানুনের সংস্কার সাধন করা হয়। কারাগার ও আইন আদালতের সুব্যবস্থা এবং প্রাণদণ্ড রদ করা হয়। হান-যুগে সরকারী চাকুরীতে কর্মচারী নিয়োগের যে পরীক্ষা চালু হয়, তাং-যুগে তার আরও উন্নতি করা হয়। এই সময়ে দেশে চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে কঠোর শাস্তির বদলে প্রজাদের কর-ভার কমানো হয়। খাজনা ও কর আদায় করার আইন পুনর্বিন্যস্ত হয়।

শিক্ষাদীক্ষার প্রসার—তাং-যুগে চীনে শিক্ষাদীক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই যুগে বিভিন্ন স্তরের উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও শিল্প কলার চর্চা বিশেষউন্নতিলাভ করে। সম্রাট মিঙ হোয়াং চাং-আন শহরে 'হ্যান্‌লিন ইউয়ান' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সম্রাটগণ ছিলেন সুধীজনের পালক ও পৃষ্ঠপোষক। এযুগে কাগজ তৈরীর বিদ্যায়, গোলা বারুদ তৈরী ও যান্ত্রিক বিদ্যায় চীন

বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এযুগে বড় বড় লাইব্রেরীরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে চীনের বহু শহর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য—হান যুগের পর তাং আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় জলপথে ও স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। চীনের বাণিজ্য তরী ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের বড় বড় বন্দরে পণ্য সামগ্রী আদান প্রদান করত। অষ্টম শতাব্দীতে পারস্য, আরব ও ভারতের ব্যবসায়ীদের সমুদ্রপথে আসা যাওয়া থেকে চীনের ব্যবসা বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পায়। আমদানী-রপ্তানির তদারকী ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য একটি সরকারী দপ্তর খোলা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে চীনে প্রচুর ধনাগম হয়। সুতরাং এই যুগকে সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগও বলা যায়। সুঙ্ যুগে চীনেই কাগজের নোট চালু হয়।

কৃষি—তাং যুগে চাষবাসেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। জমির পুনর্বন্টনের মাধ্যমে প্রজাদের সমপরিমাণ ভূমি দেওয়ার চেষ্টা হয়। যদিও ভূমিহীন প্রজা যথেষ্ট ছিল, তথাপি কৃষক-যে ভূমির মালিক হয়েছে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সেযুগে পাওয়া যায়। সরকারী চেষ্টায় জল সেচ প্রভৃতির প্রসার হলেও কখনো কখনো মন্বন্তরও দেখা দিত। দুর্ভিক্ষের সময় বিনা মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ ও চাষীদের ভূমি কর থেকে রেহাই দেওয়া হত। বাঁধ নির্মাণ ও প্লাবন রোধের চেষ্টা করে কৃষির উন্নতি বিধান করা হত।

সাহিত্য (কবিতা)—ভারতের গুপ্ত যুগের মত তাং যুগ ছিল কাব্যের স্বর্ণযুগ। চীনে তখন পদ্য রচনার ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি হয়। লি-পো, তুফু ও চু-ই-র রচনা কবিতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদ্য রচনাই বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আঠারো শতকে মাঞ্চু সম্রাটদের উৎসাহে তাং-যুগের কাব্য সংগ্রহ করে প্রকাশিত হয়। ত্রিশ খণ্ড গ্রন্থে প্রায় দু হাজারের বেশী কবির

প্রায় পঞ্চাশ হাজার কবিতা সম্পাদিত হয়। পৃথিবীতে কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

শিল্প—তাং যুগে চীনে শিল্প প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে। বিদেশী শিল্প চাতুর্যের সংমিশ্রনে চীনা শিল্প অপরূপ রূপ লাভ করে। ভারতের গান্ধার শিল্পের মত তাং-যুগে ভাস্কর্যের পরিণত রূপের প্রমাণ রয়েছে কানসু-র পশ্চিম প্রান্তে তুন-হুয়াং গুহায়। লুংমেন গুহা মন্দিরের ভাস্কর্য তাং-যুগের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্টি লাভ করে।

সেযুগে মৃৎশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়; বিশেষ করে সমাধি মৃৎশিল্প। মৃত পিতৃ পুরুষের পরিচর্যার বিশ্বাসে নর্তকী, ভৃত্য, প্রহরী প্রভৃতি মূর্তি সমাধি গর্ভে রাখা হত। এগুলির রূপ ছিল অতুলনীয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে চীনে চা-পানের অভ্যাসকে কেন্দ্র করে সুন্দর পসিলেন বা চীনামাটির বাসন তৈরী হয়। চীনের লিপির ব্যবহারের (হায়েরোগ্লাইফিক) সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাং-যুগে মর্য্যাদায় কবির পরের স্থান অধিকার করত চিত্র-শিল্পী। চীনা চিত্রশিল্পীর দক্ষতাপূর্ণ তুলির আঁচড় এখনও সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাংযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন উ-তাও-জু। তাঁকে চীনের 'র‍্যাফেল' বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকনে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তিমান শিল্পী। নবম শতকের এক চীনা লেখক ৩২০ জন চিত্রকরের কথা বর্ণনা করেছেন।

মুদ্রণ—তাং-যুগে চীনে মুদ্রণ শিল্প প্রথম বিকাশ লাভ করে। তুন-হুয়াং গুহা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো ছাপা বই পাওয়া গেছে। বইটি হল বৌদ্ধ সূত্র। সেখানে বহু পাণ্ডুলিপির সঙ্গে আরও কয়েকটি মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, গ্রন্থ মুদ্রন চীন দেশে একটি জাতীয় শিল্পরূপে পরিণত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন সাম্রাজ্যে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল পৃথিবীর মোট ছাপা বই-এর সংখ্যার চেয়েও বেশী।

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম—চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা অনুবাদ সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অষ্টম শতকের শেষাশেষি বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে প্রায় ম্লান হলেও চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও জাপানে এ ধর্ম মানুষের মনে স্থান করে নেয়।

তাং যুগে চীনা ভিক্ষুরা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়তে, বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করতে এবং বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখতে আসত। এদের মধ্যে ভারতে সুপরিচিত ইউয়েন-সাঙ-এর কথা তোমরা একটু পরেই জানতে পারবে। চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কোরিয়া, জাপান ও আনামে (ইন্দোচীন) বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচার করেন। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে নিয়ে আসা চীনা সংস্কৃতির নব নব উপকরনের (চীনা ভাষা, লিপি) ছোঁয়ায় সে সব দেশ সভ্যতার পথে বিরাট পদক্ষেপ দেয়।

অনুকরণীয় আদর্শ

তাং যুগে চীনের ইতিহাস ছিল নানা দিক থেকে গৌরবে উজ্জ্বল। শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুশাসনের মাধ্যমে ঐক্যসাধনই নয়, শিক্ষাদীক্ষা শিল্প, সাহিত্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মে চীন তখন উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। অন্য কোন দেশ তখন চীনের সমকক্ষ ছিল না।

এ যুগে চীনাদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। চীনের গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তির সার্থক উদাহরণ বিদেশী বৌদ্ধধর্মের পরম সম্মানের আসন লাভ। এ যুগেই দেখা যায় চীনে কাব্য ও সাহিত্যের উন্নতি, বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ বিকাশ ও কলাবিদ্যার নিপুণ রূপায়ণ। এছাড়া মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির ফলে, সহজলভ্য পুস্তকের প্রাচুর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। সবশেষে, তাংযুগের চীনই গড়ে তুলেছিল মহাচীনের বনিয়াদ। সুতরাং চীনের ইতিহাসে এমন কীর্তি-সমুজ্জ্বল অধ্যায়টি পৃথিবীর নানা দেশের কাছে অনুকরণের আদর্শরূপে গৃহীত।

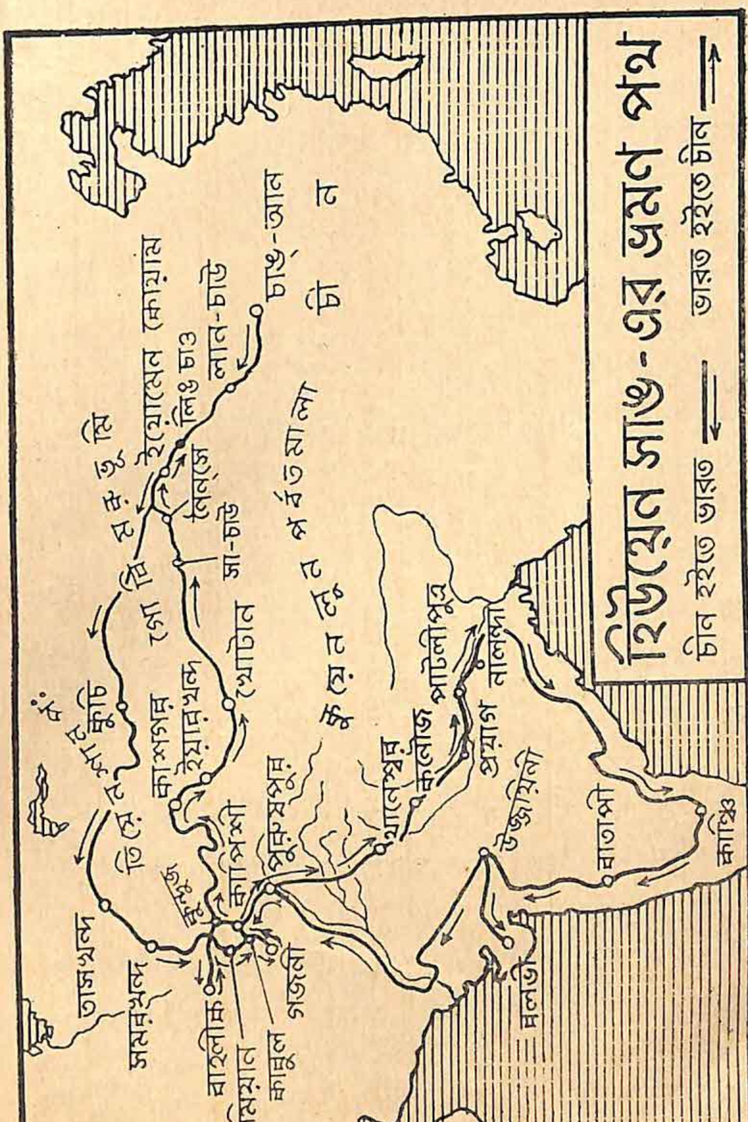
হিউয়েন-সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ ও তার প্রভাব:—ভারত-চীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিউয়েন-সাঙ একটি অবিস্মরণীয় নাম। ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে

চীনের হোনান প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধের জন্মস্থান পূণ্যভূমি ভারত দর্শন ও আসল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নও সংগ্রহের জন্য তিনি 'বাঞ্ছিতের সন্ধানে' বেরিয়ে পড়েন (৬৩০ খ্রী)।

তিনি উত্তর চীনের রাজধানী চাং-আন থেকে বহু কষ্টে গিরি মরুভূমি পার হন। তারপর তুরফান, ফরগণা, সমরকন্দ, বালখ প্রভৃতি রাজ্য অতিক্রম করে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে বর্তমান আফ-গানিস্থানের বামিয়ান নগরে উপস্থিত হন। চীন থেকে এ পর্যন্ত তার সময় লেগেছিল ৯ মাস। সেখান থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন রাজ্য গান্ধারে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তিনি ১৪ বছর (৬৩০—৬৪৪) ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে বুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থানসমূহ দর্শন করেন।

দীর্ঘকাল ভারত বাসের পর তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। হিন্দুকুশ পার হয়ে চীনের দিকে উত্তরমুখী রাস্তার বদলে এবার তিনি দক্ষিণমুখী পথ ধরে বাদাকশান, কাশগড়, খোটান হয়ে চীনের চাং-আন শহরে উপস্থিত হন ! তাঁর সঙ্গে ছিল ২০টি অশ্ববাহিত প্রায় পর্বত প্রমান সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া, সোনা রূপো, চন্দন কাঠ ও পাথরে তৈরী বহু বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের নানারূপ স্মৃতি চিহ্ন। সম্রাট তাই স্বং-এর অনুরোধে হিউয়েন-সাঙ তাঁর বিখ্যাত ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন।

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের গুরুত্ব ঃ—হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণ উভয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। চীনে বৌদ্ধধর্মের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে পড়তে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর আহৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের (৭৫ খানি) ফলে কেবল দুটি দেশেরই নয়, সমগ্র মানব


হিউয়েন সাঙ্-এর ভ্রমণ পথ
চীন হইতে ভারত
ভারত হইতে চীন
তাসখন্দ
সমরখন্দ
বাহলীক
বামিয়ান
কাবুল
গজনী
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
খোটান
কাশ্মীর
পুরুষপুর
জালন্ধর
কনৌজ
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
নালন্দা
উজ্জয়িনী
বাতাপী
কাঞ্চি
বলভী
চাঙ্-আন
লান-চাউ
চী ন

সংস্কৃতির ভাণ্ডার সম্পদশালী হয়েছে। চীন-ভারত যোগাযোগের ফলে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি ঘটে। হিউয়েন-সাঙের ভারত বিবরণ সমসাময়িক ভারতের (৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। এদিক থেকে তার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত ইতিহাসে একটি আলোক স্তম্ভ।

স্থং বংশ (৯৬০-১২৮০)

তাং-বংশের পর চীনের কয়েক দশকের ইতিহাস ছিল নানা বিশৃঙ্খলা ও অনাচারে পরিপূর্ণ। এই সময়ে সেনাপতি চাও কুয়াং-ইন সম্রাট হন এবং বিখ্যাত স্থং-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে আবার শান্তি ফিরে আসে। স্থং-বংশের রাজত্ব কালে চীনে আবার কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

স্থং-যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ— স্থং যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে! এ যুগে যাঁরা কনফুসিয়াসের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেন, সেসব নব কনফুসিয়াসবাদীরা পণ্ডিতব্যক্তিদের কেন্দ্র করে অনেক পাঠচক্রের আয়োজন করেন। সম্রাটগণও শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এ যুগে চিত্র শিল্পে, সাহিত্য, মুদ্রন ও বিদ্যাবত্তা পূর্ণরূপ লাভ করে। চীনা শিল্পীদের তুলির আচড়ে যে প্রাকৃতিক রম্যদৃশ্য রেশম কাপড়ের উপর ফুটে ওঠে তা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। চীনাদের সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টান্তরূপে এ যুগের চিত্রশিল্পের তুলনা নাই। পাণ্ডিত্যের দিক থেকেও স্থং য়ুগ গৌরবের অধিকারী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জুমা-কুয়াঙ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের ইতিহাস রচনা করেন। এ যুগেই তাই-পিং উ-লান নামে এক হাজার গ্রন্থের সমষ্টিরূপে একটি বিশ্বকোষ রচিত হয়। বিখ্যাত দার্শনিক চু-সি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন। গ্রন্থ ছাপার কল্যানে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিপুল উদ্যম দেখা দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ নববিধান—এই বংশের সম্রাট সেন-সুং-এর মন্ত্রী ওয়াং-আনসী প্রবর্তিত নববিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রশাসন ব্যবস্থার দোষত্রুটি দূর করার জন্য এবং ঋণ ভার-গ্রস্ত কৃষকের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন করে তিনি যে নতুন নিয়ম চালু করেন, তার প্রধান কয়েকটি হল বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় করণ, রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের ঋণ দান, সম্পত্তি কর ধার্য্য করণ, প্রভৃতি।

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় করণ—পূর্বে চীনে কর বাবদ ফসল দেশের নানা স্থান থেকে রাজধানীতে পাঠান হত। ফলে শস্য বহনের অসুবিধা ও ব্যয়তো হতই তাছাড়া রাজধানীর জমা স্তূপিকৃত ফসল-কর কম দামে বিক্রয় হত। ইহাতে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হত। এক রাজধানী ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে খদ্য শস্য ঘাটতি পুরণের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। এ ছাড়া রাজধানীতে স্তূপিকৃত ফসল কমদামে বিক্রয়ের ফলে রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি হত। এই অসুবিধা থেকে রাষ্ট্রও প্রজাদের রক্ষাকরার জন্য ওয়াং প্রতি জেলায় সরকারী শস্য গোলা স্থাপন করেন। সরকারী প্রয়োজন মত ঘাটতি অঞ্চলে গোলা থেকে মজুত শস্য পাঠিয়ে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি শুরু করেন। ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের আথিক ক্ষতির পরিমাণ কমে গেল অন্য দিকে তেমনি দেশের ঘাটতি অঞ্চলে ও খাদ্যাভাব কমে যায়।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিঋণ দান—পূর্বে কৃষকেরা জমি বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করত। এই ঋণ পরিশোধ করা ছিল তাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ওয়াং খুব কম সুদে কৃষকদের মধ্যে সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করেন।

সম্পত্তির উপর ধার্যকর—সে সময়ে সম্পত্তি বলতে জমিকেই বুঝাত। জমির উপর নায্য কর ধার্য্য করার জন্য ওয়াং ভূমি জরীপ করে উর্বরতা অনুযায়ী পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অনুর্বর বা

সোনাধরা জমি, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি করমুক্ত রাখেন।

এসব নববিধান জন সাধারণের পক্ষে অমঙ্গলকর ছিল না বলেই হয়ত দেশের কোথাও কোনরূপ বিদ্রোহ বা উপদ্রব দেখা দেয়নি। তবু স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতার ফলে এই নববিধান বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

ইউয়ান বংশ (১২৮০-১৩৬৮ খৃঃ)

মোংগল ঃ—ভারতে যখন দাশ বংশের সুলতানগণ রাজত্ব করছিলেন তখন মধ্য এশিয়ায় মোংগল নামে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি এশিয়া ও ইউরোপের বুকে আলোড়ন তুলেছিল। চীনের রাজবংশের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তাঁরা এক অজেয় রণনিপুণ জাতিতে পরিণত হয়। মোংগলদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন চেংগিস খান।

কুবলাই খান ঃ—চেংগিসের মৃত্যুর বাহান্ন বছর পর তাঁর এক পৌত্র কুবলাইখান মোংগলদের নেতা হন। তিনি চীনে ও মোংগলিয়ায় একচ্ছত্র অধিপতি রূপে ইউয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকালকে (১২৫৯-১২৯৪ খ্রীঃ) মোংগল শাসনের 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। তিনি আগেকার রাজধানী গোবীর মরুশহর কারা কোরাম থেকে পিকিং-এ সরিয়ে আনেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিব্বতী বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি মোংগল লিখন পরিবর্তন করে তিব্বতী বর্ণমালার ধাঁচে লিখন চালু করেন। তিনি তিব্বতী 'সামান পন্থী' বৌদ্ধ ছিলেন। ইহা ছিল



কুবলাই খান

তিব্বতী লামাদের আচার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মের এক সংস্করণ। বৌদ্ধ হলেও তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিত ফাগসপাকে রাজগুরু নিযুক্ত করেন।

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে কুবলাই-এর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান বংশ আরও ৭৪ বছর টিকেছিল কিন্তু অযোগ্য বংশধরদের জন্য ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের পতন হলে চীনে প্রসিদ্ধ মিং বংশের রাজত্ব শুরু হল।

মর্কোপোলোর ভ্রমণ

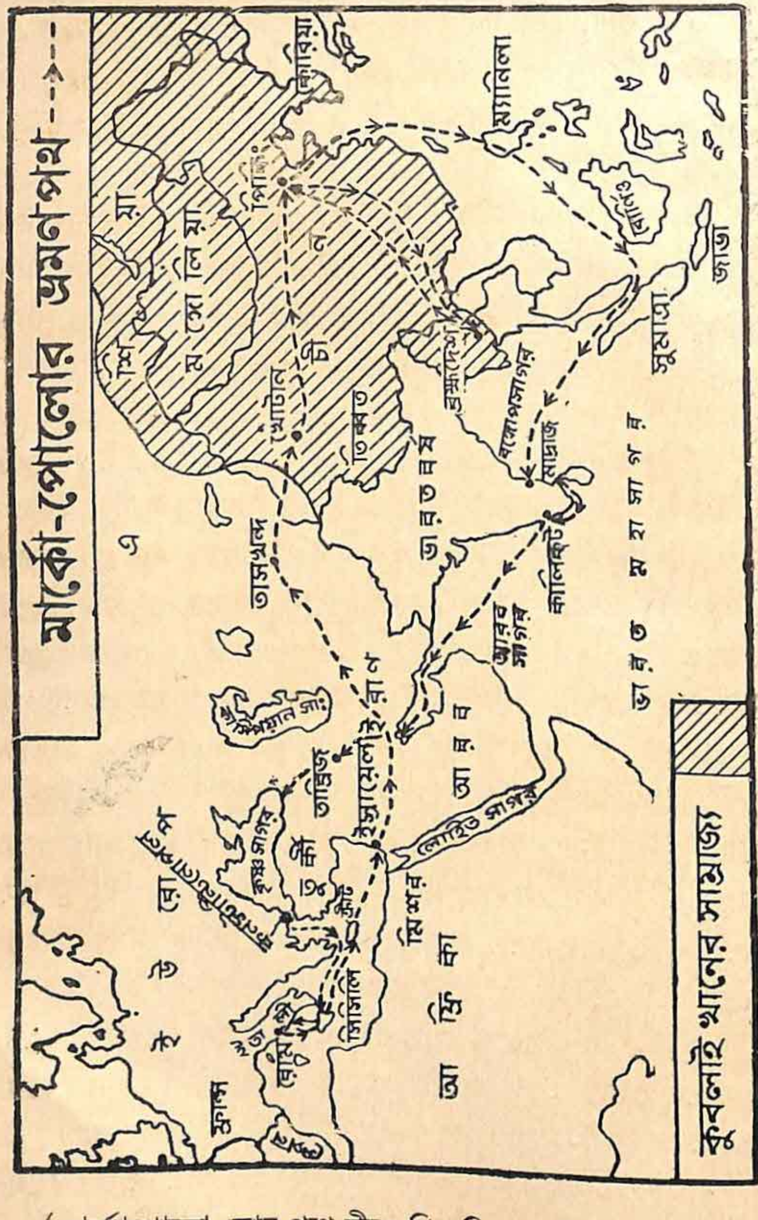
বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো তাঁর বাবা ও কাকার সঙ্গে ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট কুবলাই খাঁর দরবারে যান। তাঁরা ছিলেন ইটালির ভেনিস শহরেব অধিবাসী। মার্কোপোলো তখন বয়সে তরুণ।

ইটালী থেকে প্যালেস্টাইন, আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়া হয়ে পারস্য উপসাগরের তীরে অরমুজ বন্দরে পৌছান। সেখান থেকে পারস্যের মরুভূমি পেরিয়ে কাসগড় ও খোটান হয়ে হোয়াংহো উপত্যকা দিয়ে চীনের পিকিং শহরে উপস্থিত হন। মার্কোপোলো ইতিমধ্যে মোংগল ভাষাও শিখে ফেলেছেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ মার্কোপোলো কুবলাই-এর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি মার্কোপোলোফে হান-চাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। চীনে প্রায় ১৭ বছর সরকারী কাজে বিভিন্ন স্থান ঘুরে চীন সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

দীর্ঘদিন চীনে থেকে পোলোরা স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁরা জলপথে সুমাত্রা ও ভারত হয়ে পারস্যে পৌছান। সেখান থেকে স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেনিসে উপস্থিত হন।

মার্কোপোলোর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থাকারে রচিত হলে তাথেকে ইউরোপের লোকেরা সর্বপ্রথম দূর প্রাচ্যেরসমৃদ্ধির কথাজানতে পারেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভৌগৌলিক আবিষ্কারে প্রেরণা জুগিয়েছে।



(মার্কোপোলো কোন্ পথে চীনে গিয়েছিল ও কোন্ পথেই-বা স্বদেশে ফিরেছিল তা মানচিত্রে দেখে নাও)

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত :—মার্কোপোলো চীন সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় উহা একটি শস্যপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। রাজধানী পিকিং এর চারদিক ঘিরে ছিল মাটির উঁচু প্রাচীর। শহরটির পরিধি ছিল ২৪ মাইল। শহরের মাঝখানে আর একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা কয়েক মাইল জায়গায় ছিল সম্রাটের প্রাসাদ, কোষাগার, গ্রন্থাগার ও প্রমোদ উদ্যান। শহরের ভেতরে ছিল বিরাট বিরাট অট্টালিকা।

দক্ষিণ চীনের যেখানে মার্কোপোলো শাসনকর্তা ছিলেন সেই হান-চাউ শহরের ঐশ্বর্যের কথাও তিনি বলেছেন। সেখানকার ইটের তৈরী চওড়া রাস্তা, সুদীর্ঘখাল, ১২০০ ফিট উঁচু সেতু, বড় বড় বাজার ও দোকানপাট ছিল এক বিস্ময়ের বিষয়। সাধারণের স্নানের জন্য সেখানে বহু সংখ্যক স্নানাগার ছিল। বিলাসী নরনারীরা সূক্ষ্ম বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত। শহরের দোকানগুলিতে রেশম, মণিমুক্তা, অলঙ্কার ও মশলা বিক্রী হত।

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে ব্রহ্মদেশ, জাপান ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। ব্রহ্মরাজ দুহাজার হাতি নিয়ে যুদ্ধ করেও কুবলাই খাঁর কাছে হেরে যান। সে সময় জাপান ছিল স্বর্ণময় দেশ। ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাণী রুদ্রম্মার রাজত্বের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘজীবি যোগীদের কথাও বলেছেন যাদের পরমায়ু ছিল দেড়শো, দুশো বছর। মার্কোপোলো সম্রাট কুবলাই খাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে :

১। চীনে তাং বংশের (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা লি-উয়ানের পুত্র ছিলেন কীর্তিমান তাই-সুং। এই বংশের অপর এক প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন মিং-হুয়াং। তাংযুগ চীনের 'স্বর্ণময় যুগ' রূপে অভিহিত।

২। তাংযুগের পর শুরু হয় সুংযুগ (৯৩০-১২৮০ খ্রীঃ)। এ বংশের সম্রাট সেন সুং-এর মন্ত্রী ওয়াং-আনসী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নতুন আইন চালু করেন।

৩। সুংবংশের পর ইউয়ান বংশের (১২৮০-১৩৬৯ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুবলাই খাঁ। তিনি ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর রাজত্ব কালেই বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপেলো চীন ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কথা আমরা তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানতে পারি।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) তাং বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? (খ) এ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কি? (গ) তাং যুগের শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি? (ঘ) কাকে চীনের র‍্যাফেল বলা হয়? (ঙ) হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন? (চ) সুংবংশের কোন্ মন্ত্রী নব বিধান চালু করেন? (ছ মোঙ্গলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? (জ ইউয়ান বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? (ঝ) মার্কোপোলো চীনের কোন্ শহরের শাসন কর্তা ছিলেন? (ঞ) তিনি কোন্ দেশকে স্বর্ণময় বলেছেন? (ট) সে সময় ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের রানী কে ছিলেন?

আত্মসমীক্ষা

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

হানদের প্রায় — বছর পরে শুরু হয় — বংশের রাজত্ব। তারপর আসে — বংশের রাজত্ব। ভারতে — শিল্পের মত তাং যুগে ভাস্কর্যের উন্নততর প্রমাণ রয়েছে — পশ্চিম প্রান্ত — গুহায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ ঃ

১। তাং যুগে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার সম্বন্ধে যা জান লেখ। ২। তাং যুগে চীন কেন অনুকরণের আদর্শস্থলরূপে অভিহিত? ৩। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ। ৪। সুং যুগের চিত্রকলার পরিচয় দাও।

পূর্ণাঙ্গ উত্তর দাও ঃ

প্রসিদ্ধ ইটালীয় পর্যটক মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যা জান লিখ।

করণীয় কাজ ঃ

তাং যুগে নতুন নতুন রাজ্য জয়ের ফলে চীনের, মহাচীনে রূপান্তরের সূচনা পর্বটি একটি মানচিত্র এঁকে দেখাও।

(খ) মধ্যযুগের জাপান

জাপান দেশটির অবস্থান ও উহার নামকরণঃ—এশিয়া মহাদেশের পূর্ব সীমান্তে জাপান। এদেশের অধিবাসীরা তাঁদের দেশকে বলে "নিপ্পন" অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ। শোনা যায় এখানেই প্রথম সবিতৃদেবের আবির্ভাব ঘটে। তারপর তাঁর সাতটি ঘোড়ায় টানা সোনার রথে চড়ে তিনি প্রদক্ষিণ করেন ভূমণ্ডল। চীনের অধিবাসীরা এদেশকে বলত 'জি-পুন'। তারই জাপানী উচ্চারণ হল 'নিপ্পন'। পাশ্চাত্যের ভ্রমণকারীরা এই 'জি-পুন' কে করে নিয়েছে জাপান। এরও আগে জাপানের নিজস্ব একটা নাম ছিল—'ইয়ামাতো'

আদি মধ্যযুগে জাপানে সমাজ ও সামন্ত অর্থনীতি ঃ—আদি মধ্যযুগে জাপানের সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায় 'কোজিকি' ও 'নিহনশোকি' নামে দুটি পুরাণ বা ইতিবৃত্ত থেকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানের আদিশ্রেণী সমাজে ছিল স্বাধীন কৃষক; ভুমিদাস আর ছিল দাস শ্রেণীর মানুষ যাদের বলা হত ইটা। এরা সমাজে ছিল অস্পৃশ্য। এদের কাজ ছিল এখনকার কষাই এর মত। এদের উপরে ছিল কৃষক ও কারিগড় শ্রেণী, তাঁর উপরে শিল্পী। সে সময়ে ভূমির সঙ্গে বাধা ছিল সমাজে মর্যাদার মাপকাঠি। বণিকদের তাই কোন সম্মান ছিল না। আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়দের মত ছিল সামুরাই বা সেনানী শ্রেণী। সমাজে এদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। আর ছিল বৃহৎ জমিদারীর মালিক দাইমিও যাঁরা অভিজাত শ্রেণীরূপে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল।

আদি মধ্যযুগে জাপানে ছিল কৃষিভিত্তিক সামন্ত অর্থনীতি। অর্থনীতির মূল উপাদান ছিল ধান চাষ। দুর্বহ করভারে কৃষকগণ ছিল জর্জরিত। সামন্ত অর্থনীতি সমাজকে করে তোলে অন্তঃসারশূন্য।

ইউরোপের বড় বড় সামন্তদের মত জাপানে ছিল কতকগুলি বংশ বা গোষ্ঠীভুক্ত শাসক পরিবার। এই বংশগুলির মধ্যে সম্রাট পরিবার

প্রধান হলেও তাদের সাহায্যে সম্রাট শাসনকার্য চালাতেন। এসব শাসক পরিবারগুলির অধীনে ছিল জমিদারী। ইউরোপের ম্যানরের মত এসব বেসরকারী জমিদারীকে বলা হত 'শোয়েন'। শোয়েন-গুলিকে কোন কর দিতে হত না এবং সম্রাট ও রাজকর্মচারীদের এখানে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এসব বৃহৎ জমিদারী বা শোয়েনের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই সরকারী রাজস্ব ভীষণভাবে কমতে থাকে। ফলে সম্রাটও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। মাঝে মাঝে শোয়েনগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বে আনার চেষ্টা হলেও তা ব্যর্থ হয়। আদি মধ্যযুগে জাপানে ছিল অর্থনীতির এরূপ চেহারা।

মিকাডো তাঁর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা ঃ—জাপানের সম্রাটকে বলা হয় মিকাডো। দেবতার বংশধর বলে তিনি জাপানীদের নিকট মর্ত্তের দেবতা। অতুলনীয় শ্রদ্ধার আসনে তাঁরা বসিয়ে রেখেছেন তাঁকে। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে তিনি ঐক্যের প্রতীক। জাপানীরা সম্রাটের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করত। সম্রাটকে তাঁরা তাঁদের সুখশান্তিরও উৎসরূপে মনে করত। সূর্যের সন্তান বলে সম্রাটদের গৌরবের সীমা ছিল না। জনগণের পূজো পেয়েই সম্রাটরা ছিলেন খুশী। তাঁরা শুধু রাজত্ব করতেন, শাসন করতেন না। দেশের প্রকৃত শাসক ও শোষক ছিল বড় বড় অভিজাত সামন্ত বা জমিদার পরিবারের প্রধানগণ।

আদি মধ্য যুগে সম্রাটের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। রাজা নামে সর্বশক্তিমান হলেও কতকগুলি শাসক পরিবার (শোজা, সুমেরাগি, ফুজিওয়ারা ইত্যাদি) প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করত। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সম্রাট এদের দিতেন বিশাল সম্পত্তি ও প্রভূত ক্ষমতা। এসব অভিজাত বংশগুলির মধ্যে প্রথম শোজা বংশ ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আধিপত্য লাভ করে। তারপর সুমেরাগি, ফুজিওয়ারা ইত্যাদি পরিবার সম্রাটকে মোমের পুতুলের মত ক্ষমতার দিক থেকে

নিষ্ক্রীয় করে রাখে। এদের মধ্যে আবার ক্ষমতা নিয়ে লেগে যেত মারামারি কাটাকাটি। এসব ঘটনা ঘটে জাপানের ইতিহাসে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে। সম্রাট কোন কোন সময় চেষ্টা করেও এদের ক্ষমতা একেবারে খর্ব করতে পারেন নি।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ :—ক্ষুদ্র জাপানের নিকটতম প্রতিবেশী হল বিশাল চীন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীন ছিল জাপানের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। ইউরোপের নানা দেশ যেমন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা গ্রহণ করেছে, তেমনি জাপান করেছে চীনের।

চতুর্থ শতক থেকে জাপানে চীনারা ছিল সভ্যতার অগ্রদূত। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রথমে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপানে প্রবেশ করে। তখন থেকে জাপানে রাস্তা তৈরী, এবং নানা হাতের কাজের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এমন কি চীনাদের মত জাপানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো তৈরী হতে থাকে। ধীরে ধীরে চীনা পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, শিল্পী, কারিগর জাপানে বসবাসের ফলে জাপানের সভ্যতা, জীবনযাত্রা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন চীনের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়।

তার পর জাপানে এল বুদ্ধের বিশ্বধর্ম। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে জাপানের প্রকৃত ইতিহাসের 'যাত্রা হল শুরু'। এ ধর্মের সঙ্গেই আসে কনফুসিয়াসের নীতি ধর্ম, চীনা ভাষা, সাহিত্য, লিপি ও শিল্পকলা। এ ভাবে একদিকে কনফুসিয়াসের নীতিধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম অপরদিকে চীনা সভ্যতা, এ দুয়ের প্রভাবে সপ্তমশতাব্দীর মাঝামাঝি জাপানের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে!

সার্বভৌম ক্ষমতা ও শিণ্টোধর্মের প্রধান পুরোহিতরূপে মিকাডো :—তখন থেকে চীনা রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সম্বন্ধে জাপানীরা যে ধারণা লাভ করে সেগুলিকেই ব্যবহারিক জীবন তথা সামাজিক

জীবনে নানা সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে থাকে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যুবরাজ শোতোকু তাইশি (৫৯৬-৬২১ খ্রীঃ) এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি গোষ্ঠিভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিলতা থেকে জাপানকে মুক্ত করে রাজশক্তিকে দৃঢ় করতে চাইলেন। চীনের মত জাপানে সামন্ত সমাজের মৌল নীতিগুলি শিতোকোর আইনে লিপিবদ্ধ হল। তিনি সম্রাটের ক্ষমতা ও জনগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেন। এগুলিকেই বলা হয় শেতকুতাইশির বিধানাবলী।

৬২১ খ্রীষ্টাব্দে শোতোকুর মৃত্যুর পর, চীনে প্রেরিত জাপানি দূত ফিরে এসে তাং বংশের আমলে দক্ষ সরকার ও চীনাদের উন্নত জীবন-যাত্রার কথা বর্ণনা করেন। এরফলে রাজাজ্ঞায় ঘোষিত হল **তাইকোয়া বা মহান সংস্কার** (৬৪৫ খ্রীঃ)। চীনের ধারা অনুসারে জাপানে নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। জমির উপর রাজস্ব ও কর ব্যবস্থা সংশোধিত হল ও নতুন প্রদেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত হল। এখন থেকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন স্বয়ং সম্রাট। সম্রাটকে নামে মাত্র রেখে যে কয়টি বৃহৎ শাসক পরিবার প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করছিল, নতুন আইনের বলে তাঁদের প্রাধান্য লোপ করা হল। ফলে সম্রাট পদের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল। প্রাচীন জাপানী ধর্ম শিণ্টোধর্মের (ঈশ্বরের পথ) প্রধান পুরোহিত হলেন সম্রাট। চীনের সম্রাটদের মত তাঁকে ঈশ্বরের অবতার ও সূর্যদেবীর সাক্ষাৎ বংশধররূপে প্রতিষ্ঠা করা হল। সম্রাট তেন-চি একাধারে রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়ের প্রধানরূপে স্বীকৃত হলেন। ফলে জাপানে এল ঐক্যবদ্ধ রাজতন্ত্র। এই সময়ে জাপানের প্রথম স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয় 'নারা' শহরে। রাজধানী নারার নাম অনুসারে এই যুগকে (৭১০—৭৯৪ খ্রী) নারা যুগ বলে।

বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলির বাধাদানঃ—সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি বৃহৎ গোষ্ঠীভূক্ত পরিবারগুলির স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল বলে তাঁরা প্রচণ্ড বাধা দেয়। এদের মধ্যে ফুজিওয়ারা পরিবার ছিল প্রধান।

এই পরিবার সম্রাটকে ক্রীড়নক করে তোলে। এমনকি সম্রাটের সিংহাসন লাভ বা পদচ্যুতি এই পরিবারের ইচ্ছাধীন ছিল। পরবর্তী তিন শতাব্দী (নবম, দশম ও একাদশ) চলে তাঁদের শাসন। এই সময় রাজধানী হেইয়ান বা কিয়োটোয় সরিয়ে আনা হয়। রাজধানীর নাম অনুসারে এই যুগকে হেইয়ান যুগ বলা হয়। এযুগ স্থায়ী হয় ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

শেষের দিকে তাইরা ও মিনামোতো নামে দুই শক্তিশালী পরিবারের উত্থানে ফুজিওয়ারারা পাশার গুটির মত উল্টে গেল। তাইরাদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মিনামোতো পরিবারের নেতা ইয়ুরিতোমো জয়লাভ করে। তিনি সম্রাট কর্তৃক 'শোগান' বা বর্বর দমনকারী সেনানায়ক উপাধী লাভ করেন (১১৯২ খ্রীঃ)। তখন থেকে শুরু হয় এই পরিবারের দুর্দ্ধর্ষ শাসন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তারে সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাসঃ-- রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে জাপানে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরগুলি রাজশক্তির বিরোধীতা করে। এগুলির অধীনে ছিল বড় বড় ভূসম্পত্তি এবং সেগুলি ছিল সরকারী কর ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এসব ভজনালয়গুলি আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী পর্যন্ত নিয়োগ করে। নানা অধিকারের প্রশ্নে এগুলির সঙ্গে সম্রাটের বিরোধ বাধে। সুতরাং এক দিকে বৃহৎ পরিবারগুলির ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব, অপর দিকে বৌদ্ধ ভজনালয়গুলির বিরোধীতার ফলে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

শুধু রাজনৈতিক অব্যবস্থাই যে সম্রাটের ক্ষমতাকে দুর্বল করে তুলছিল তাই নয়; বৌদ্ধ ও শিন্টো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে হেইয়ানের রাজপথে অহঃরহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত। এর প্রতিকারে সম্রাট ছিলেন নীরব দর্শক। ফলে সম্রাটের মর্যাদা অনেকটা কমেযায়।

সামুরাই ঃ—আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়দের মত জাপানের সামরিক শ্রেণীকে বলা হত সামুরাই। মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্তদের মত জাপানের দাইমিওরা তাদের 'শোয়েন' বা জমিদারী রক্ষা করাব জন্য সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। ইউরোপের নাইটদের মত এরা ছিল সাহসী ও আদর্শবান। দাইমিওদের বেতনভোগী যোদ্ধা রূপে তাঁরা জমিদারী রক্ষা করে জমিদারদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। সামুরাইদের বীরত্বও মহত্বের জন্য জাপানের ইতিহাসে দীর্ঘ সাত শতাব্দী কাল ধরে তাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।



সামুরাই

বুশিদো ঃ—'বুশিদো' কথাটির অর্থ হল বীরধর্ম। ইউরোপে সামন্তযুগে যেমন নাইটদের মধ্যে বীরধর্ম বা শিভ্যালরি সৃষ্টি হয়েছিল ; জাপানেও যোদ্ধা শ্রেণীর মধ্যে অনুরূপবীরধর্ম গড়ে ওঠে। যোদ্ধাশ্রেণী বা সামুরাইদের আচার-ব্যবহার ওন্যায়-নীতি সম্পর্কে ধারণা এই 'বুশিদো' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। 'বুশিদো' বা বীরধর্মে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও আত্মত্যাগের শপথের উপর। যোদ্ধাশ্রেণীকে মর্যাদাবোধ, সংযত ব্যবহার ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রভৃতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হত। যোদ্ধাশ্রেণীর পালনীয় এইসব আচরণ বিধিকেই জাপানী ভাষায় 'বুশিদো' বলা হয়। দায়িত্ব পালনে অসমর্থ সামুরাইদের আত্মহত্যাকেই বলা হয় 'হারাকিরি'।

শোগানঃ—শোগান একটি উপাধি। এর অর্থ বর্বর দমনকারী সেনানায়ক। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিনামোতো পরিবারের ইয়ুরিতোমো সম্রাট কর্তৃক এ উপাধি লাভ করেন। তিনি কামাকুরা নামক স্থানে সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন বলে, তাঁর বংশের শোগানদের বলা হয় কামাকুরা শোগান। এদের পরে আসে বিখ্যাত সেনাপতি ইযেযাশুর তোকুগাওয়া শোগান বংশ। তিনি 'এদো' তে (টোকিওর তৎকালীন নাম) ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব শোগুনেৎ বা শোগান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী ২৬৫ বছর জাপানে এদের শাসন চলে। তারপর ১৮৬৭ সালে রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ ঘটে। শুরু হয় নবযুগ—জাপানী ভাষায় "মেইজী"।

অনুশীলনী

বিশেষ করে মনে রাখবে ঃ

১। জাপান বা 'নিপ্পন'কে চীনরা বলত জি-পুন। জি-পুনকে পাশ্চাত্যের অধীবাসীরা করে নিয়েছে জাপান। মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি ছিল সামন্ত তান্ত্রিক। ইউরোপের ম্যানরের মত জাপানে ছিহ 'শোয়েন'। শোয়েনের জমিদার ছিল ক্ষুদে রাজার মত।

২। জাপানের সম্রাটকে বলা হত মিকাডো। সম্রাট হলেও তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। কতকগুলি জমিদার পরিবারের প্রধান গণ ছিল প্রকৃত শাসক। সম্রাট ছিলেন অনেকটা তাঁদের হাতের পুতুল।

৩। চীনের প্রভাবে এসে জাপানে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তা থেকে সম্রাট তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত সামন্ত পরিবারগুলি তাতে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত সম্রাট আবার সামন্ত শক্তির অধীন হয়ে পড়ে। এরপর সম্রাট শোগান উপধীধারী প্রধান সেনাপতির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। জাপানে শোগানদের দুর্দ্ধর্ষ শাসন চলে প্রায় সাতশো বছর ধরে। তারপর জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়।

অভীক্ষণ

মুখ মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) জাপানীরা তাদের দেশের নামকে কি বলে ? (খ) জাপান কথাটির নাম কিভাবে হয়েছে ? (গ) জাপানের সামাজিক অবস্থার কথা কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ? (ঘ) শোতোকু কে ছিলেন ? (ঙ) 'শোয়েন'-এর অর্থ কি ? (চ) জাপানের 'শিভ্যালরি'কে কি বলা হত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ফুজিওয়ারাদের শাসনের সময় রাজধানী — বা — সরিয়ে আনা হয়। নতুন রাজধানীর নাম অনুসারে এই যুগকেই—যুগ বলা হয়।

আত্মসমীক্ষা

১। **টীকা লেখ ঃ** মিকাডো ; শোয়েন ; সামুরাই ; বুশিদো।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ** (ক) আদিমধ্যযুগে জাপানের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? (খ) 'তাইকোয়া' ঘোষিত হওয়ার ফলে কি হয়েছিল ? (গ) চীনের সংস্পর্শে এসে জাপানীদের জীবনে কি কি পরিবর্তন ঘটে ? (ঘ) গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফলে জাপানে কি হয়েছিল ?

করণীয় কাজ ঃ

জাপানের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে মধ্যযুগে যে যে জায়গায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে বর্তমান রাজধানীরও অবস্থান দেখিয়ে দিদিমণি কিম্বা মাষ্টার মশাইকে দিয়ে ঠিক হয়েছে কিনা জেনে নেবে।

নীচের সময়গুলি মনে রাখবে ঃ

(ক) ৫২২ খ্রীঃ = জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ।

(খ) ৫৯৬-৬২১ খ্রীঃ = প্রিন্স শোতোকু তাইশি।

(গ) ৭১০-৭৯৪ খ্রীঃ = নারাযুগ।

(ঘ) ১১৯২-১৮৬৭ খ্রীঃ = কামাকুরা, আসিকাগা ও তোকুগাওয়া শোগান যুগ।

(চ) ১৮৬৭ খ্রীঃ = জাপানে নবযুগ বা মেইজী।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত

(ক) **গুপ্তযুগের শেষ পর্ব ঃ** খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গুপ্তবংশের সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) ছিলেন শেষ শক্তিশালী সম্রাট। তাঁর সময়েই দেখা দেয় ভারতের বাইরে থেকে এক মস্ত বিপদ। শোন এবার সে বিপদের কথা।

ইউরোপে হুন আক্রমণ তোমরা গোড়াতেই পড়েছ। সেখানে হুন আক্রমণের প্রায় একই সময়ে তাঁদের অপর এক শাখা (শ্বেতহুন) ভারতেও হানা দেয়। সৌভাগ্যবশতঃ স্কন্দগুপ্ত তাঁদের আক্রমণের স্রোত আটকে ছিলেন। কিন্তু তার পর দুর্বল সম্রাটদের আমলে হুনরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকে পড়ে।

হুনদের পরিচয় ঃ হুনরা ছিল মধ্য এশিয়ার মংগোল নামে এক মরুচর ও যাবাবর জাতির লোক। খাদ্য ও চারণভূমির সন্ধানে তাঁরা মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম দিকে এগোতে থাকে। তাদের এক শাখা অক্ষুনদী (বর্তমান আমুদরিয়া) পার হয়ে আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। ইতিহাসে এরা **শ্বেত হুন** নামে পরিচিত। এই শ্বেত হুনরাই পরে ভারতে আসে। হুনদের অপর এক শাখা চলে যায় ইউরোপের দিকে। এটিলার নেতৃত্বে তারাই ইউরোপে লুণ্ঠন চালিয়ে রোম আক্রমণ করে।

হুন আক্রমণ ঃ হুনদের যে শাখার নাম ছিল শ্বেতহুন, তাঁদের প্রবল চাপে ইউচি নামে আর এক উপজাতির মানুষ গিয়ে ঢুকল শকদের দেশে। ইউচিদের তাড়া খেয়ে শকরা গিয়ে পড়ে ব্যাকট্রিয় (বহ্লীক) গ্রীকদের দেশে। এ দিকে, হুনদের তাড়া খেয়ে যে ইউচি উপজাতি পালাতে থাকে তাঁদেরই কুষাণ নামে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করে। হুনরাও থেমে থাকে নি। তাঁরা একের পর এক পারস্য, কাবুল ও উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে লুণ্ঠন ও আক্রমণ চালায়।

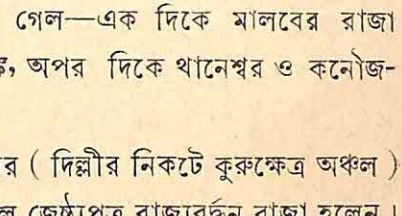
হুনরা যখন পারস্যে প্রবেশ করে তখন সেখানকার সম্রাট ছিলেন ফিরোজ। তিনি হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। হুনরা জয়লাভ করে পারস্যে তাঁদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই কাবুল অধিকার করে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে! কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এমন কি মধ্য প্রদেশের উত্তরাংশ জুড়ে হুনরা একটি বড় হুণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়ে হুনদের নেতা ছিলেন তোরমান। তাঁর পুত্র মিহিরকুলের রাজধানী ছিল পাঞ্জাবের শাকল বা শিয়ালকোট। অমানুষিক অত্যাচারীরূপে তিনি কুখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু মন্দির ও স্তূপ ধ্বংস করেন এবং অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে গ্রাম নগর ছারখার করে দেন। তিনি যখন বর্ত্তমান মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র পর্যন্ত এগিয়ে আসেন, তখন উত্তর ভারতের রাজাদের টনক নড়ে। গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের রাজারা তাঁকে পরজিত করেন। মিহিরকুল মালবের দিকে চলে যান! মালবের রাজা যশোধর্মনও তাঁকে হারিয়ে দেন। মিহিরকুল তখন চলে যান কাশ্মীরে। তাঁর মৃত্যুর পর হুনদের শক্তি এমই কমে গেল যে, রাজস্থানের কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ভিন্ন আর কোন অঞ্চল হুনদের অধীনে রইল না

হুনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ হুন শক্তির পতনের পর ইতিহাস থেকে তাদের নাম ধাম প্রায় মুছে গেলেও তাঁরা বেঁচে রইলেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন ক্ষত্রিয় কুলে। শকরা যেমন এর আগে হিন্দু সমাজেয় সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্ষত্রিয় বনে গিয়েছিল তেমনি হুনদেরও আর আলাদা করে চেনা গেল না! 'এদেশের অধিবাসীদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে তাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেল। ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যাওয়া হুনদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল গুর্জর প্রতিহার গোষ্ঠী। ক্ষত্রিয় রূপে ভারতীয় সমাজে তাঁরা যে সম্মান পেয়েছেন তার

প্রতিদানে তাঁরা ভারতকে রক্ষা করেছেন বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। **গুর্জর প্রতিহাররা প্রকৃতই ভারতের প্রতিহারীর কাজ করেছিলেন।**

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঃ গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ দুশো বছরেরও বেশী (৩২০—৫৫১ খ্রীঃ) সময় ধরে গৌরবের সঙ্গে ভারতে রাজত্ব করেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী শাসনের অবসানে তখন গড়ে ওঠে কতকগুলি ছোট রাজ্য। এদের মধ্যে মালব, গৌড় (বাংলাদেশ), কনৌজ এবং থানেশ্বর ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চারটি শক্তি নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনে দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল—এক দিকে মালবের রাজা দেবগুপ্ত ও গৌড়ের রজো **শশাঙ্ক**, অপর দিকে থানেশ্বর ও কনৌজ-রাজ রাজ্যবর্দ্ধন ও গ্রহবর্মা।

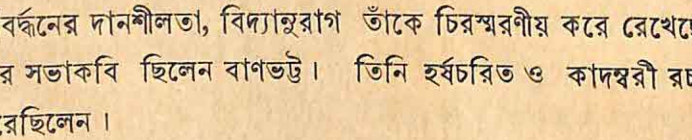
হর্ষবর্দ্ধনের যুগ ঃ থানেশ্বরের (দিল্লীর নিকটে কুরুক্ষেত্র অঞ্চল) রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যু হলে জেষ্ঠ্যপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন রাজা হলেন। তাঁর ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মা, মালবরাজ দেবগুপ্তের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করে অল্প কালের মধ্যেই মারা যান। ছোট ভাই **হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের রাজা হলেন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে।** তিনি থানেশ্বরও ও কনৌজ—এই দুটি রাজ্যেরই শাসনভর গ্রহণ করেন। কনৌজ হ'ল তার রাজধানী। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতে কামরূপ


হর্ষবর্দ্ধন

রাজ ভাস্কর বর্মা এবং পশ্চিম ভারতে বল্লভীর রাজা ধ্রুবসেন তার বশ্যতা মেনে নেন। উৎকল, কলিঙ্গও কাশ্মীরেও তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন।

সর্বভারতীয় ঐক্যের ধারণা সঙ্কুচিত হয়ে শুধু উত্তর ভারতীয় ঐক্যে পরিণত হল ঃ হর্ষবর্দ্ধন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি গৌড় রাজ্যের একটি বড় অংশ অধিকার করে নেন! হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করে 'মগধ রাজ' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বেলায় হর্ষবর্দ্ধন গুপ্ত সম্রাটদের মত এগিয়ে যেতে পারেন নি। দাক্ষিণাত্য অভিযানে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে বাধা পেয়ে ফিরে আসেন। কনৌজ সাম্রাজ্য উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে সর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্যিক ঐক্যের ধারণা সঙ্কুচিত হয়ে শুধু উত্তর ভারতীয় ঐক্যে পরিণত হয়। তাই হর্ষবর্দ্ধন হলেন 'উত্তরা পথনাথ'। উত্তর ভারতেও যে সব রাজ্য হর্ষের বশ্যতা মেনে নেয়, তাঁদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না। তাই তার সাম্রাজ্যের বাঁধনও তেমন সুদৃঢ় ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধনের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। প্রায় চল্লিশ বছর (৬০৬ —৬৪৭ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের সম্রাট। তাঁর সময় থেকেই কনৌজ উত্তর ভারতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। হর্ষবর্দ্ধনের দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট। তিনি হর্ষচরিত ও কাদম্বরী রচনা করেছিলেন।



হর্ষবর্দ্ধনের স্বাক্ষর

হর্ষবর্দ্ধন নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত **'রত্নাবলী'**,

'নাগানন্দ', 'প্রিয় দর্শিকা, প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। তাঁর রাজত্বকালে আগত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত বিবরণীতে হর্ষবর্দ্ধনের খুব প্রশংসা করেছেন। আনুমানিক ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়।

হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণ

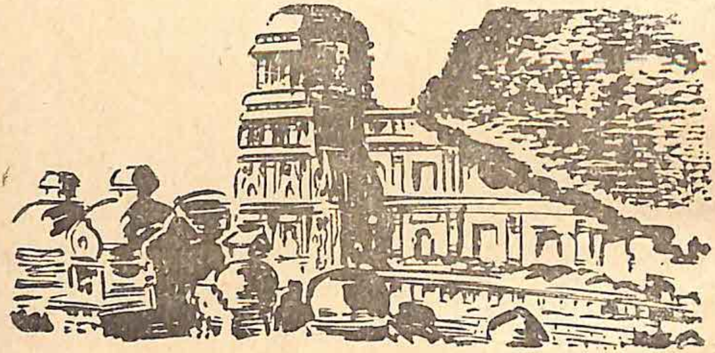
বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত হিউয়েন সাঙ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশ হতে 'বাঞ্ছিতের সন্ধানে' পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে আসেন। তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর ভারতে থেকে এদেশের নানাস্থান পরিদর্শন করেন। তিনি দু বছর কাশ্মীরে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শিয়ালকোট, জলন্ধর, মথুরা হয়ে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কনৌজে উপস্থিত হন। তারপর বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থ স্থানগুলি দর্শন করেন। হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্দ্ধন আয়োজিত কনৌজের ধর্ম সম্মেলন ও প্রয়াগের মহামেলা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। হর্ষের দানশীলতা সম্বন্ধেও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।



হিউয়েন সাঙ্

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণ ভারত বাসীর গৌরবের বিষয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে ব্রাহ্মণদের দর্শন শাস্ত্র, বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণ সমূহেরও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হত। এখানে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। জীবন ধারণের

চারটি মৌল প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা ও ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হত। নালন্দা ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র। ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। ছাত্রদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে হত। ১৫০০ শিক্ষক ৮৫০০ ছাত্রকে একশটি বিষয়ে পাঠ দান করতেন। এখানে ছিল তিনটি বৃহৎ পাঠাগার—রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক। এখানকার



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকদের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন অন্যান্য বহুর মধ্যে ধর্মপাল, গুনমতি, জীনমিত্র এবং শীলভদ্রের কথা। দীর্ঘ সাতশত বছরের বিদ্যাচর্চ্চার গৌরবময় ইতিহাস রেখে গেছে এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। পাল রাজত্বের অবসানে ইহার গৌরবও অস্তমিত হয়। বিহারের রাজগীরে বেড়াতে গেলে নিকটেই দেখতে পাবে নালন্দার বহু চিহ্ন।

(খ) **হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্তীকাল ঃ**—হর্ষবর্দ্ধনের যুগে উত্তর ভারতে কনৌজকে ঘিরে যে রাজনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক উন্নতি দেখা দিয়ে ছিল, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর তার অবসান ঘটে। সে সময়ে শশাঙ্কের পর বাংলাদেশে পাল রাজ্য, পশ্চিম ভারতে বল্লভী (গুজরাট), মধ্য ভারতের বাকাটক, দক্ষিণ রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজ্যবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ভারতে ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব না থাকলেও গৌরব টিঁকে ছিল। কনৌজে তখন আয়ুধ পদবীধারী এক দুর্বল রাজবংশ রাজত্ব করছিলেন। কনৌজ অধিকারই ছিল উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্যের মানদণ্ড। তাই কনৌজকে ঘিরে উত্তর ভারতে ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই ত্রিশক্তি হলো রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহার বংশ, বাংলার পালরাজবংশও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশ।

কনৌজের আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ চলে তার শেষ নিষ্পত্তি হয় প্রতিহারদের পক্ষে। তা হলেও ত্রিশক্তির প্রত্যেকেই এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে এই তিনটি রাজ্যেরই পতন ঘটে। রাষ্ট্রকূটদের অধিকৃত অঞ্চল চালুক্যদের অধীনে চলে যায় ; পালদের রাজ্য সেন বংশের হাতে চলে যায়। আর প্রতিহারদের বিরাট রাজ্যও ভেঙ্গে পড়ে। এর ভগ্নস্তূপের উপরই গড়ে ওঠে পরমার, চেদী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য। এ ছাড়া উত্তর ভারতে চম্পক (ছাম্ব), দুর্গর (জম্বু), কুলুট (কুলু), প্রভৃতি ছোট ছোট পার্বত্য রাজ্যেরও উদ্ভব হয়।

রাজপুতনার গোষ্ঠী ভিত্তিক সামন্ত রাজ্যসমূহ—হর্ষবর্দ্ধনের পর উত্তর ও মধ্য ভারতে এমন কয়েকটি সামন্ত রাজবংশের উদ্ভব হয় যাঁরা রাজপুত বলে খ্যাতি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস তাদের বীরত্বে উজ্জ্বল। এই সময়কার রাজপুত বংশগুলির মধ্যে ৭টি ছিল প্রধান—মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের 'বাঘেলা' ও 'চৌলুক্য' বংশ, বুন্দেলখণ্ডের 'চান্দেল্ল' বংশ জব্বলপুরের 'চেদী বা 'কলচুরী' বংশ, দিল্লীর 'তোমর বংশ' ও আজমীরের চৌহান বংশ।

মালবের পরমার বংশের রাজপুত রাজগণ প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল ধারা নগরী। ইহা সংস্কৃত

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন 'ভোজরাজ'। তিনি শুধু বড় যোদ্ধাই ছিলেন না, সুপণ্ডিতও ছিলেন। চালুক্য, চেদী ও চৌলুক্যগণের আক্রমণে পরমার রাজ্যের পতন হয়।

গুজরাটের বাঘেলা ও চৌলুক্য বংশ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে চৌলুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। সোমনাথের বিখ্যাত হিন্দু মন্দির এই রাজ্যে অবস্থিত। এরা মুসলীমদের সহিত বহু বছর ধরে যুদ্ধ করেন। এদের রাজধানী ছিল অনহিলবারা বা পাটন। এই বংশের রাজা প্রথম ভীমের রাজত্বকালে সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কর্ণের সময় সুলতান আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক এই রাজ্য অধিকৃত হয়।

বুন্দেল খণ্ডের চান্দেল্ল রাজগণ প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করেন। ধঙ্গ ছিলেন এই বংশের প্রধান রাজা। রাজধানী খাজুরাহ নগরে চান্দেল্লগণ যে জৈন মন্দির নির্মাণ করেন তা ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির অন্যতম।

জব্বলপুরের চেদী রাজগণ প্রায় ২৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। সামরিক দিক থেকে চেদী রাজপুতগণ উত্তর ভারতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেন। লক্ষ্মী কর্ণ ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

দিল্লীর তোমর বংশ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। তবে এ বংশের রাজা অনঙ্গপাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লী নগরী স্থাপন করেন।

এই শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজপুতনায় অজয় দেব চৌহান আজমীর নগর স্থাপন করেন। অজয় দেবের পুত্র বিগ্রহ রাজ দিল্লী জয় করেন। তার ভ্রাতুস্পুত্র পৃথ্বিরাজ তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

(গ) **মহারাজ শশাঙ্ক:** বঙ্গদেশ গুপ্তদের শাসনে বেশীদিন থাকেনি। গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

'বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্ক প্রথম সার্বভৌম নরপতি'। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক উত্থান পতনের ঘটনাবলীতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি দণ্ডভূক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও কপোদ রাজ্য জয় করেন। বাংলার পশ্চিমে মগধেও তিনি রাজ্য বিস্তার করেন।

রাজা শশাঙ্কের সাথে লড়াই বাধল কনৌজের রাজাদের। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা শশাঙ্কের ভয়ে ভীত হয়ে থানেশ্বর এবং কনৌজের সাথে মিত্রতা করলেন। শশাঙ্ক মিত্রতা করলেন মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে। দুই দলে বাধালো লড়াই। থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন হারিয়ে দিলেন দেবগুপ্তকে কিন্তু শশাঙ্ক হারিয়ে দিলেন রাজ্যবর্ধনকে।

রাজ্যবর্ধনের পর থানেশ্বর ও কনৌজের সম্রাট হলেন তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ কিম্বা বৌদ্ধ পুঁথি অনুযায়ী মনে হতে পারে শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শশাঙ্ক আর হর্ষবর্ধনের মধ্যে হারজিতের কোন প্রমাণ নেই। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন বলে তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মদ্বেষী বলা হয়েছে। শশাঙ্ক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

পাল ও সেনযুগে জীবন যাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থা ঃ

জীবন যাত্রা ঃ—পাল ও সেনযুগে বাঙ্গালীরা কৃষিকার্যে খুব দক্ষ ছিলেন। ধান, তুলো, সরষে, পান প্রভৃতি ফসলের চাষ আবাদ হত। তাঁরা আম কাঁঠাল, নারকেল, সুপারী কলা প্রভৃতি ফল ফলাতেন। এখনকার মতো সেযুগেও নানা সামগ্রী হাটে বাজারে বেচা কেনা হতো। এখন আমরা যেমন ভাত, মাছ, দুধ দই ইত্যাদি খেতে ভালবাসি, সে যুগেও বাঙ্গালীরা এ সব খাদ্য খেতেন। পরিধেয় রূপে তাঁরা ধুতিও শাড়ীর ব্যবহার করতেন। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তাঁরা সে যুগেও পালন করতেন। এছাড়াও ছিল নানা আচার অনুষ্ঠান ও

উৎসব। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, বাঙ্গালীরা ছিল সরল ও সাধু প্রকৃতির।

সমাজব্যবস্থাঃ—ভারতের মূল হিন্দু সমাজ হতে আলাদা না হলেও পালযুগেও সেনযুগে বাংলার সমাজ জীবনে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য থেকে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। সেযুগে বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বর্ণ ছাড়াও ক্ষৌরকার, মালাকার, গন্ধবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরিচয়ও পাওয়া যায়। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালী সমাজজীবনে নানা রীতিনীতি অনেক শিথিল হয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে সামাজিক সংস্কার করে সমাজে শৃঙ্খলা আনার জন্য চেষ্টা হয়। সেনরাজ বল্লাল সেন বাংলার সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেন। ফলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতির মধ্যে আহার বিহারে নানা নিয়ম ও সামাজিক বিভাগ চালু হয়। সে যুগে সমাজে অস্পৃশ্যতার প্রচলন দেখা যায়।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে শিক্ষাদীক্ষায় ও ধর্ম-কর্মে বাংলায় এক নবযুগের সূচনা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন টোল ও চতুষ্পাঠী-গুলিতে শিক্ষাদান করতেন। উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এযুগে খুবই গৌরব অর্জন করে।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে কয়েকটি বিহার তৈরী করেন। এগুলির মধ্যে সোমপুর, ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে ছিল সোমপুর বিহার। নালন্দার কাছে ছিল ওদন্তপুর। এখানে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পরে তিনি বিক্রমশীলার আচার্য পদে নিযুক্ত হন।

ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশীলা সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করে। এই বিহার-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনা হত। বিজ্ঞান ভবনটি ছিল মহাবিহারের এক কেন্দ্রস্থলে। ইহার ছয়টি দ্বার ছয়টি বিদ্যাভবনের

দিকে খোলা থাকতো। এক একজন দ্বার পণ্ডিত এক একটি বিদ্যাভবনের দেখাশুনা করতেন। এখানে মোট ১০৮টি মঠ ছিল। এগুলি পরিচালনার জন্য ছিল ১০৮টি মঠাধ্যক্ষ। বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অভয়ঙ্কর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, ধর্মকীর্তি এবং অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত।

পালযুগের ন্যায় সেন যুগেও বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি খুব উন্নতি লাভ করে। এই যুগকে সংস্কৃত কাব্যের স্বুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। সেনযুগে বহু সাহিত্যিক ও কবিদের রচিত অমূল্য গ্রন্থ সে যুগের গর্বের বিষয়। কবি ধোয়ী রচিত 'পবন দূত', উমাপতি ধর রচিত 'চন্দ্রচুড়', সর্বানন্দরচিত 'টীকা সর্বস্ব,' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণ সেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তার রচিত 'গীত গোবিন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ। ইহা রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী নিয়ে রচিত।

ধর্ম :—পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাই লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম পাল যুগের বিহার ও মঠে আবার যেন জেগে ওঠে। কিন্তু পাল রাজারা ধর্মের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। সে সময় শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজো হত।

সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। তাই হিন্দুদের নানা পূজো পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান আবার বড় হয়ে ওঠে। শিব পূজো ও শক্তি আরাধনা অর্থাৎ কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজো খুব চালু হয়। বাংলার হিন্দু সমাজে শক্তি আরাধনার ধারা এখনও পূর্ণ গৌরবে বয়ে চলেছে।

দক্ষিণ ভারত

বাদামীর চালুক্য বংশ

প্রথম পুলকেশী :—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে বাদামীর চালুক্য বংশের অধীনে শক্তিশালী চালুক্য রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান মহারাষ্ট্রের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত বাদামী নগর এই

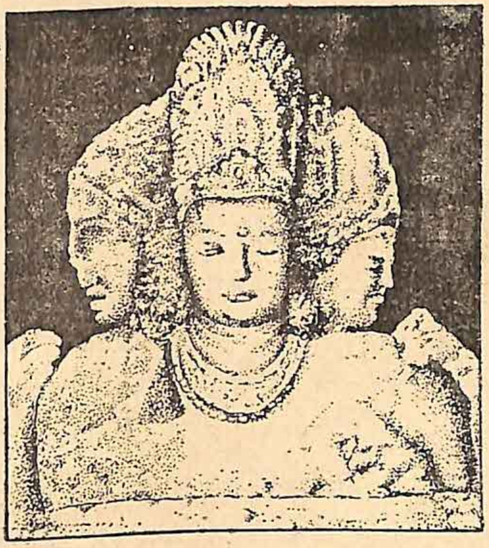
রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখন এ নগরের নাম ছিল বাতাপী। বাদামীর চালুক্য রাজগণ প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করেন। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী।

দ্বিতীয় পুলকেশী ঃ—এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯—৬৪২)। তিনি গুজরাট, মালব, কোঙ্কন, মহিশূর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন! চোল, পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্য তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে। উত্তর ভারতে কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। নর্মদা নদী—দুই সাম্রাজ্যের সীমানা স্থির হয়েছিল! তিনি কাঞ্চীর পল্লব রাজকেও পরাজিত করেন। এই ভাবে তিনি দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হন। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ্ বাদামীর রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশী ও তাঁর সাম্রাজ্যের খুব প্রশংসা করেন। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশী কাঞ্চির পল্লব বংশীয় রাজা নরসিংহ বর্ম্মনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা দন্তিদুর্গ বাদামীর চালুক্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। ইতিমধ্যে কাঞ্চীর পল্লবগণ প্রবল হয়ে ওঠে।

কাঞ্চীর পল্লববংশ ঃ—সুদূর দক্ষিণ ভারতের পূর্বউপকূলে পল্লব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্চী।

পল্লব বংশীয় রাজারা প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করেন। পল্লব রাজ নরসিংহ বর্মণের সময় পল্লব বংশ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে! তিনি ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে পল্লবগণের সঙ্গে চালুক্যগণের বহুদিন ধরে সংঘর্ষ হয়। নরসিংহ বর্মন চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি পাণ্ড্যদেশ ও সিংহলেও আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্রের নিকট পল্লবগণের পরাজয় হয়। এভাবে চালুক্য-পল্লব শক্তি পরীক্ষায় উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পল্লব রাজ্য চোলদের অধিকারে চলে যায়।

শিল্প ও স্থাপত্যে চালুক্য ও পল্লবদের অবদান :— দক্ষিণ ভারতের এ দুটি বিরাট স্বাধীন রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। চালুক্যরাজগণ শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অজন্তাও ছিল চালুক্য রাজ্যের মধ্যেই। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণে চালুক্য স্থাপত্য ও শিল্পের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চালুক্য রাজগণ বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রাজধানী বাদামী ও বিজাপুরের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের

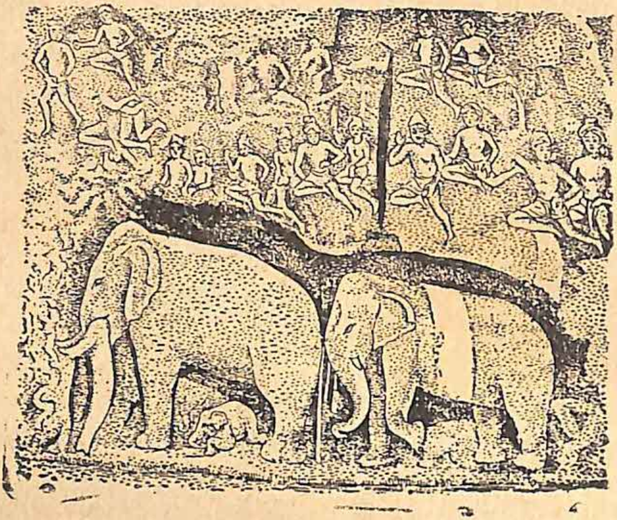


শিবের ধ্যানমগ্ন ত্রিমূর্তি—এলিফ্যাণ্টা

বিরাট মন্দিরগুলি চালুক্য স্থাপত্যের গৌরব বহন করছে। অজন্তা ও হাতী গুহার কোন কোন প্রাচীন চিত্র চালুক্য শিল্পের নমুনা বলে অনেকে মনে করেন। এলিফ্যাণ্টার গুহাচিত্রগুলিরও কয়েকটি এবংশের শিল্পকীর্তি। গোটা পাহাড় কেটে মন্দির নির্মানের ভারতীয় রীতির সূচনা চালুক্য যুগেই হয়।

দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের রাজত্ব কাল শিল্প ও স্থাপত্যের স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। মহাবলীপুরমে পাহাড় খোদাই করে বিভিন্ন জন্তুর মূর্ত্তি গড়ে তোলা পল্লব শিল্প ও স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য।

মামল্লপুরমের সাতটি রথ মন্দির গোটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। কাঞ্চীর কৈলাস নাথ মন্দির দ্রাবিড়শিল্প রীতির সুন্দর



মহাবলীপুরমে পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য

পরিচয়। দ্রাবিড় শিল্প রীতির সঙ্গে আর্য রীতির মিশ্রণই পল্লবদের সবচেয়ে বড় দান।

চোল নৌশক্তি ঃ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বণিকরা জল পথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করছিলেন। ফলে চোলরাজ্য খুব সম্পদশালী হয়ে ওঠে। চোল রাজাদের আমলে এই রাজ্য খুব প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে রাজেন্দ্র চোলের সময় সামুদ্রিক অভিযান খুব খ্যাতি অর্জন করে।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা হতেই চোলদের সঙ্গে যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র রাজাদের সংঘর্ষ ঘটে। একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল এক বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে জল পথে সাম্রাজ্য বিস্তারে বেরিয়ে পড়েন। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার কিছুটা অংশ তিনি অধিকার করেন। এরপর তিনি যবদ্বীপ আক্রমণ করেন। চোল ও শৈলেন্দ্র রাজাদের লড়াই চলে বহুদিন ধরে। পরে মূল

ভূখণ্ডে নানা কারণে চোলদের শক্তি দুর্বল হতে থাকলে তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারে ভাঁটা পড়ে।

চোলগণের নৌ-শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগরে বিস্তৃতি লাভ করে। সিংহল, ব্রহ্মদেশের পেগু রাজ্য এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও চোল সাম্রাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে ঃ

১। হুনরা জাতিতে ছিল মঙ্গোলীয়। তাঁরা মধ্য এশিয়া থেকে পারস্য, কাবুল ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তাদের নেতা ছিলেন তোরমান। তিনি বালাদিত্যের নিকট পরাজিত হলে হুনরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁরা ভারতীয় সমাজে মিশে যায়।

২। হর্ষবর্দ্ধনের যুগে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। কনৌজ হয় এই শক্তির কেন্দ্র। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি শশাঙ্ককে হারাতে পারেন নি। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। হর্ষের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। তিনি ভারত সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ লিখে গেছেন।

৩। হর্ষের পরবর্তী যুগে হয় রাজপুত 'জীবন প্রভাত'। রাজপুতদের বীরত্বে ভারতের ইতিহাস হয়ে ওঠে উজ্জ্বল।

৪। কনৌজ অধিকার প্রশ্নে উত্তর ভারতে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ হয়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলে এই ত্রিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যেই এদের পতন হয়।

৫। গৌড়ের রাজা বীর শশাঙ্ক বাংলা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

৬। পাল ও সেন যুগে জীবনযাত্রা ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় এখনকার মত। সমাজে ছিল কৌলিন্য প্রথা ও বর্ণভেদ। শিক্ষা-দীক্ষায় তখন বাংলা এক গৌরবময় আসন লাভ করে।

৭। দাক্ষিণাত্যের দুটি শক্তিশালী রাজবংশ হল—একটি বাদামীর চালুক্য বংশ ও অপরটি কাঞ্চীর পল্লব বংশ। তাঁদের আমলে শিল্প ও স্থাপত্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। চোল বংশীয় রাজাদের আমলে নৌশক্তি খ্যাতিলাভ করে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

হুনদের যে শাখা ভারতে আসে তাঁরা কি বলে পরিচিত ? ভারতে হুন নেতার নাম কি ? গুপ্ত বংশের শাসনকাল কত দিন স্থায়ী হয়েছিল ? 'উত্তরপথ নাথ' কাকে বলা হত ? হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীন থেকে কে এসেছিলেন ? হর্ষ-শশাঙ্কের যুদ্ধে কে জয়লাভ করে ? হর্ষের পর কনৌজকে নিয়ে যে তিনটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় সে তিনটি শক্তি কি কি ? রাজপুতদের মধ্যে প্রধান কয়টি বংশের নাম কর। পাল রাজারা কোন্ কোন্ বিখ্যাত বিহার তৈরী করেছিলেন ? জয়দেবের শ্রেষ্ঠ রচনা কি ? কা'র সময়ে চোল নৌশক্তি খ্যাতিলাভ করে ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

নালন্দা — ভারত ও ভারতের — থেকে বহু — এখানে — করতে আসতেন। এখানে — শিক্ষক — ছাত্রকে — বিষয়ে পাঠদান করতেন।

আত্মসমীক্ষা

বিবরণ লিখ ঃ

হুনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ; হিউয়েন সাঙ-এর ভারত বিবরণ ; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ; পালযুগে হিন্দুদের পূজো পার্বণ ; চোল নৌশক্তি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ

(ক) সেন যুগে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক কি কি বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ?

(খ) "পাল ও সেন যুগের কাছে বাংলা সংস্কৃতি ঋণী" – এই কথার তাৎপর্য কি ?

(গ) শিল্পে ও স্থাপত্যে চালুক্য ও পল্লবদের অবদান আলোচনা কর।

পূর্ণাঙ্গ উত্তর লিখ ঃ

১। উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ ঘটে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৩। দক্ষিণ ভারতের বাদামীর চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লবদের বিষয়ে যাহা জান লিখ।

করণীয় কাজ ঃ ভারতের একটি রেখা মানচিত্র এঁকে কনৌজ, গৌড়, থানেশ্বর, নালন্দা, বিক্রমশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্যগুলির অবস্থান দেখাও।

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে এসেছে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রীসের মত ভারতবর্ষ নানাদেশে বসতি বিস্তার করে নতুন নতুন রাজ্য গড়ার গৌরব অর্জন করে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রায় ষাট বছর পর সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক বিদেশী রাজার দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। কুশান রাজাদের আমলে ভারত ও রোমের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই যুগেই এশিয়া মহাদেশের এক বিরাট অংশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে।

ধর্মপ্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজকার্য্য ও অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে ভারতবাসী পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এদের অনেকেই স্থায়ীভাবে বিদেশে ঘর সংসার পেতে ভারতের উদার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ, প্রেরণা ও শিল্পকলা ভারতের বাইরে নানা দেশের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করে। বহির্ভারতে গড়ে ওঠা এই বসতি বা উপনিবেশগুলিই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সংস্কৃতি ও উপনিবেশ যে যে অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে সেগুলির সমষ্টিকেই বলা হয় 'বৃহত্তর ভারত, দ্বীপময় ভারত'। বহির্ভারতে গড়ে ওঠা উপনিবেশ স্থল ও জল উভয় পথেই প্রসার লাভ করে।

স্থলপথ ঃ খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বছর আগে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়েছিল। মধ্য এশিয়া হতে চীনে এবং চীন হতে জাপান, কোরিয়া ও আনাম-এ ইহা প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সূত্রপাত হয়েছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে। বর্তমান

আফগানিস্থান এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এককালে ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। ধর্মে ও সংস্কৃতিতে ঐ সব জনপদ ছিল ভারতের অঙ্গ। কাপিশী, গান্ধার প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলি ছিল বর্তমান আফগানিস্থানের অংশ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এসব রাজ্যগুলির শ্রেষ্ঠীদের কাছে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে করতে এগিয়ে চলেন মধ্য এশিয়ার দিকে। এইসব শ্রেষ্ঠীরা ব্যবসা বাণিজ্য করে খুব ধনবান ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা নির্মাণ করান বিহার, সঙ্ঘারাম ও স্তূপ। কারিগর দিয়ে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে গড়ে তোলেন বুদ্ধের বিশাল মূর্ত্তি। আফগানিস্থানের মধ্যে বামিয়ানে বিশাল আকার বুদ্ধ মূর্ত্তি এখনও রয়েছে। মূর্ত্তিটি প্রায় ১৭৪ ফুট উঁচু। এছাড়া সেখানে অনেক গুহা মন্দির আছে। এসব মন্দিরে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারা ফুটে আছে। এগুলির সঙ্গে ভারতের অজন্তা গুহার ছবির খুব মিল দেখা যায়।

বামিয়ান থেকে হিন্দুকুশ পেরিয়ে বহ্লীক দেশ। কুষাণ সম্রাটরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে বহ্লীক দেশটি বৌদ্ধদের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সপ্তম শতকে পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ বলেছেন এই দেশের রাজধানীর নাম বলা হত রাজ গৃহপূর। সেখানে একশোর বেশী বৌদ্ধ বিহার ও প্রায় তিন হাজার ছিল ভিক্ষু।

পামীর মালভূমি পার হয়ে কাশগড়, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি শহর-গুলিতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহাযান বৌদ্ধমত প্রসার লাভ করে। তারপর বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র খোটানের বৌদ্ধ বিহারগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার রাজা বিজয় জয় ছিলেন বৌদ্ধ। খোটানে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ অরেল ষ্টেন এখানে বহুবিহার ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছেন। এগুলিই ভারতীয় উপনিবেশের স্বাক্ষর বহন করে।

খোটান থেকে চীনে যাওয়ার পথে কুচা নগর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার জীবের জন্মস্থান। তিনি কাশ্মীরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে

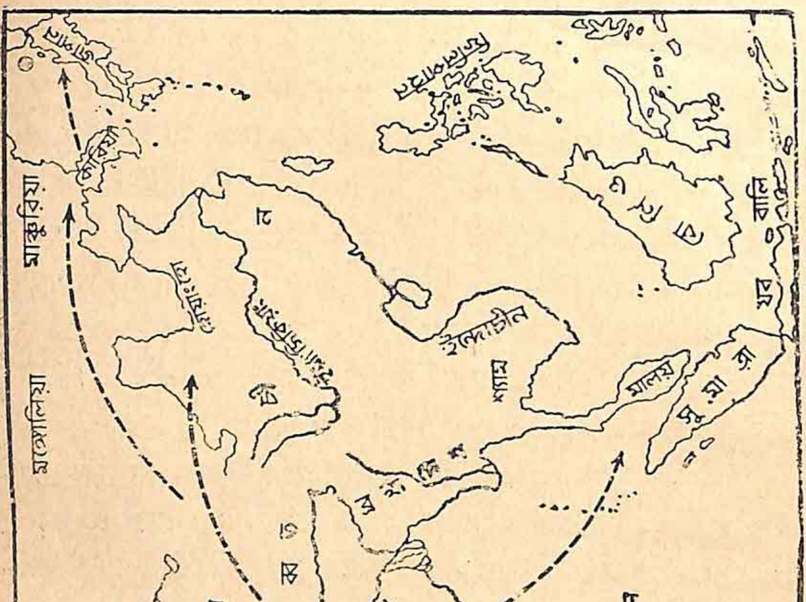
পরে ত্রিশ বছর চীনে থেকে বহু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

নেপাল হতে তিব্বতের ভেতর দিয়ে চীনে যাওয়ার রাস্তা ছিল। হর্ষের রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। সে সময়ে একজন শক্তিশালী রাজা তিব্বত শাসন করছিলেন। তার নাম স্রঙ-স্তান গাম-পো। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তিব্বতে ভারতীয় লিপির প্রবর্ত্তন করেন। চীনা পণ্ডিতদের মত অনেক তিব্বতী পণ্ডিত নালন্দায় শিক্ষা লাভ করতে আসেন। ভারতবর্ষ হতেও বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিনি সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তিব্বতী ভাষায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

অতীশ দীপঙ্কর ঃ তিনি ঢাকা জিলার (বর্তমান বাংলাদেশ) বিক্রমপুরের এক রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছেলে বেলার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি ১৯ বছর বয়সে ওদন্তপুর বিহারে বিদ্যা চর্চা করেন এবং পরে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে যান। সেখানে ১৩ বছর কঠোর পরিশ্রম করে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার ও বৌদ্ধ শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

জলপথে ঃ—বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয়রা সাগর পাড়ি দিয়ে ভারত মহাসাগরের বুকে সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালী, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন ও উন্নত ভারতীয় সভ্যতার বীজ রোপণ করেছিলেন। শুধু ঐ দ্বীপসমূহেই নয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি উপদ্বীপের দেশগুলিতেও একই কারণে তারা বসতি করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি গ্রহণ করে।

মান চিত্রের উপর চোখ বোলালেই বোঝা যায় যে, ভারতের পূর্বতীর থেকে সমুদ্র পাড়ি দিলে সামনে পড়ে বর্মা ও মালয়। মালয় উপদ্বীপই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জলপথে প্রথম উপনিবেশ। তারপর



ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রভাবিত স্থান

শ্যাম ও কম্বোজের দিকে কেউ কেউ পাড়ি দিয়েছে। সেখানে তাঁরা মেকং নদীর মুখে বসতি করে। মালয় থেকে সমুদ্র পথে ঘুরে পূর্বতীরেও উপনিবেশ গড়ে (বর্ত্তমান সিঙ্গাপুর অঞ্চল)। উপনিবেশ বলতে

বোঝায় বণিকদের আড়ত বা ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। সে সব স্থানে অধিকাংশ বণিকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে হিন্দু-বৌদ্ধ-সংস্কৃতির পত্তন করে। এদের মধ্যেই কোন কোন ধনপতি হয়ে ওঠে ভূপতি এবং তা থেকে এমনকি হয়ে ওঠে নরপতি।

বঙ্গোপসাগরের পরপারে ছিল সুবর্ণভূমি। সুবর্ণভূমি কোন বিশেষ দেশের নাম নয়। প্রাচীনকালে সমুদ্র পারের দেশ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ আসতো বলে তাদের নাম হয় সুবর্ণভূমি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের নাম না জানা এক গ্রীক নাবিকের বর্ণনা, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির ভূগোল ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আমরা স্পষ্টই জানতে পারি যে, দ্বিতীয় শতকে পূর্বসাগরে ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় সাহিত্যে, কাব্যে, সদাগর পুত্রদের ধনরত্নের সন্ধানে সুবর্ণভূমি বা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার বহু কাহিনী আছে।

সুবর্ণভূমির খোঁজে কেহ গিয়েছেন ব্রহ্মদেশে, কেহ গিয়েছেন আরও পূর্বে। ফলে ব্রহ্মদেশ হতে ইন্দোচীন পর্যন্ত সমস্ত দেশে এবং বোর্নিও, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি ছোট বড় দ্বীপের সাথে ভারতীয়দের পরিচয় ঘটে। ভারতীয় বলতে এখানে ভারতীয় বণিক, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু যারা এসব অঞ্চলে সভ্যতা প্রচার করেন।

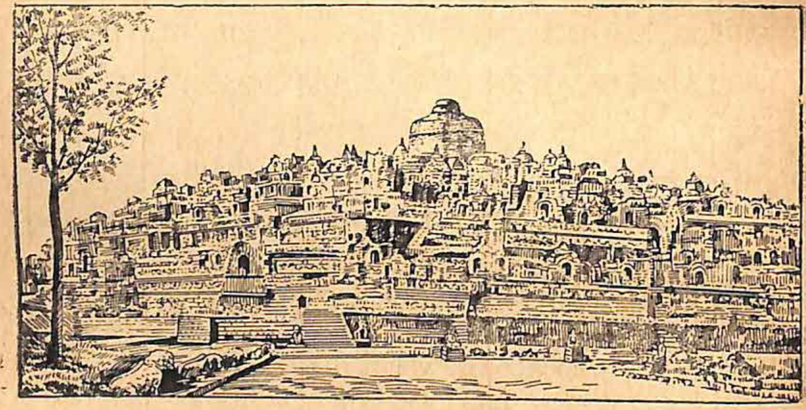
সুবর্ণভূমির নানা দেশে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ও মূত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরগুলির নির্মান কৌশলে গুপ্তযুগের শিল্পকলার ছাপ খুব স্পষ্ট। সুবর্ণভূমির অধিবাসীরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করত।

অষ্টম শতাব্দীতে সুবর্ণভূমির অধিকাংশ রাজ্য একটি প্রবল রাজবংশের অধীনে চলে যায়। ইহার নাম শৈলেন্দ্র রাজবংশ। এদের রাজধানী ছিল সুমাত্রার শ্রীবিজয় নগর। এই নগরে চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিং বহুদিন বসবাস করে ভারত থেকে নেওয়া সংস্কৃত পুঁথি পণ্ডিতদের সাহায্যে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে যাতায়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে শৈলেন্দ্র

রাজাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধ সাধু কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজ্যে গিয়ে রাজগুরুর পদ লাভ করেন।

যে সকল জনপদ নিয়ে দ্বীপময় ভারত গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে যবদ্বীপের (জাভা) ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টলেমির গ্রন্থেও চীনের ইতিহাসে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে চীনা-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যবদ্বীপে কিছুকাল থাকেন। প্রায় নবম শতকে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র রাজাদের অধীনে আসে। এদের সময়ই যবদ্বীপের বিখ্যাত মন্দির বরবুদর ও অন্যান্য মন্দির নির্মিত হয়।

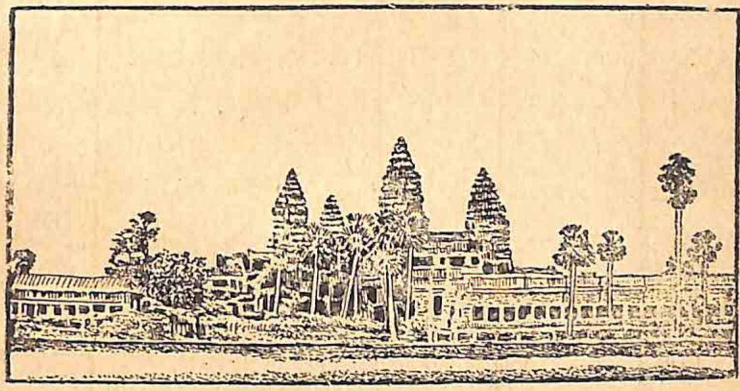
বরবুদর :—বিখ্যাত বরবূদর মন্দির শৈলেন্দ্র রাজাদের গৌরবময় যুগে নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে নির্মিত



বরবুদর মন্দির

হয়েছিল। একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রস্তর নির্মিত এ বিশাল মন্দিরটি সকলের বিস্ময়ের বিষয়। সংস্কৃতকাব্য 'ললিত-বিস্তার', 'দিব্যা-বদান', প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে অলৌকিক জীবনকথা বলা হয়েছে তা খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বরবুদরের পাথরে পাথরে। এই মন্দিরটি পরপর নয়টি স্তরে গঠিত। মন্দিরের চূড়ায় ঘণ্টার আকারে তৈরী এক স্তূপ। খুব সঙ্গতভাবে বরবুদরকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়েছে।

বৃহত্তর ভারতের আর একটি রাজ্য কম্বোজ বা কম্বোডিয়া (বর্তমান কাম্পুচিয়া)। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু রাজারা কম্বোজ শাসন করেন। নবম শতাব্দীতে রাজা যশোবর্মণের রাজত্ব কাল থেকে এই রাজ্যের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তিনি কম্বোজ পুরীতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন নগরীর নাম হল 'আঙ্কোর থম'।



আঙ্করভাট মন্দির

এখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আঙ্কোরের পূর্ব নাম যশোধরপুর —প্রায় নয় মাইল ব্যাপী ছিল এই নগর।

কম্বোজ রাজ্যে একটি অক্ষয়কীর্ত্তি হল পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির **'আঙ্কোর ভাট'**। রাজা দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ইহা একটি বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরটি প্রায় দুশো ফুট উঁচু। তার পরিধিও ছিল বিশাল। ইহা একটি বিস্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন।

অনুশীলনী

নীচের কথাগুলি মনে রাখবে ঃ—

১। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের ছিল অতি প্রাচীন সংযোগ। ধর্মপ্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজকার্য, অধ্যাপনা ও উপনিবেশ গড়বার কাজ চলেছিল একই সাথে।

২। এভাবে ভারতের প্রভাব নিকটপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, মঙ্গোলিয়া চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব অঞ্চলের সমষ্টিকেই বলা হয় বৃহত্তর ভারত, দ্বীপময় ভারত।

৩। ভারতকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর ভারত, দ্বীপময় ভারতের যোগাযোগ ছিল স্থলপথে ও জলপথে।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

ভারতবাসী কিভাবে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত? 'বৃহত্তর ভারত' শব্দের অর্থ কি? মধ্য এশিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল? কুমার জীব কে ছিলেন? স্রঙ স্তান-গামপো কে ছিলেন? অতীশ দীপঙ্করের ছেলেবেলায় কি নাম ছিল? টলেমি কে ছিলেন? শৈলেন্দ্র রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল? কোন্ স্থাপত্য নিদর্শনকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়ে থাকে? পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দিরটির নাম কি? উহা কোথায় অবস্থিত?

আত্মসমীক্ষা

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১। 'দ্বীপময় ভারত' কথাটির অর্থ কি? ২। 'স্থবর্ণ ভূমি বলিতে কি বুঝ'? ৩। আঙ্কোয়থম, আঙ্কোরভাট, বরবুদর বিখ্যাত কেন? ৪। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল? ৫। উপনিবেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক কেমন ছিল? স্যার অরেলষ্টেন কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

কম্বোজ রাজ্যের একটি অক্ষয় — হল পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির —। রাজা দ্বিতীয় — নির্মাণ করেন। ইহা একটি — মন্দির।

পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন ঃ

ভারতেয় বাইরে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের বিবরণ দিয়ে একটি নিবন্ধ লেখ।

করণীয় কাজ ঃ

তোমার আঁকা একখানি বড় মানচিত্রে বৃহত্তর ভারতের অঞ্চলগুলি ও ভারতের সঙ্গে সেগুলির যোগাযোগের পথ দেখাবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর তুর্কী-আফগান সুলতানদের কথা

তুর্কী-আফগানদের ভারত আগমন ঃ—হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) একশো বছরের মধ্যে দিকে দিকে ইসলামের পতাকা উড়তে থাকে।

আরবগণ-কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয়ের (৭১২ খ্রীঃ) প্রায় তিনশো বছর পর, আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। ২৫ বছরের (১০০০-১০২৫ খ্রীঃ) মধ্যে পর পর ১৭ বার চলে এ আক্রমণ। নানা যুদ্ধে জয়ী হয়েও তিনি কিন্তু ভারতে রইলেন না। বিপুল ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন নিজ রাজ্য গজনীতে।

মামুদের সময় থেকে দেড়শো বছর পর আবার ভারত আক্রান্ত হয়। এবারের আক্রমণকারী আফগানিস্তানেরই ঘোর নামে অপর একটি রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘোরী। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথিরাজকে পরাজিত করে তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

মামুদ ও ঘোরী আফগানিস্তানের দুই রাজ্যের অধিপতি হলেও তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ার তুর্কী। তাই তাদের বলা হয় তুর্কী-আফগান। ঘোরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুলতানী তাই তুর্কী-আফগান সুলতানীরূপে অভিহিত।

সুলতান মামুদ ও ঘোরীর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ছিল কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের ধনসম্পদ সংগ্রহ। তাই লুটপাট করেই তিনি ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। অপর দিকে ঘোরী গড়লেন স্থায়ী মুসলিম রাজ্য।

এযুগের সুলতানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

(ক) দাসবংশ (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ)—নিঃসন্তান মহম্মদ-ঘোরীর অবর্তমানে তার সেনাপতি কুতুবউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। প্রথম

জীবনে তিনি ছিলেন ঘোরীর ক্রীতদাস। এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুলতানী বংশকে 'দাসবংশ' বলা হয়। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস ও বলবনই ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলতুৎমিস দেশের নানা স্থানে বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি দিল্লীর কুতুব-মিনার।

ইলতুৎমিসের মেয়ে সুলতানা রিজিয়া দক্ষতার পরিচয় দিলেও স্বার্থান্বেষী ওমরাহদের চক্রান্তে তিনি নিহত হন।

কিছুদিন অরাজকতা চলার পর সুলতান হন গিয়াসউদ্দিন বলবন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও দৃঢ়চিত্ত। তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করে তিনি দিল্লীর সুলতানীকে সুদৃঢ় করেন।

(খ) খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) : দাসবংশের অবসানে, খলজী নামে এক নতুন বংশের সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের সবচেয়ে খ্যাতিমান সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী। তিনি প্রায় সারা ভারত জয় করেন। তিনি শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারই করেন নি, বহিঃশত্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ ও প্রতিহত করেন। তাঁর বাস্তববুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। শুধু খলজী বংশেরই নয়, তিনি ছিলেন তুর্কী-আফগান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতান। কুতুব মিনারের সঙ্গে প্রসিদ্ধ 'আলাই-দরওজা।' তাঁর দ্বারাই নির্মিত হয়।


আলাউদ্দিন খলজী

(গ) **তুঘলক বংশ** (১৩২০-১৩৯৯ খৃঃ): খলজী সুলতানীর অবসানে তুঘলক নামে আর এক নতুন বংশের সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন মহম্মদ বিন-তুঘলক। তিনি সুপণ্ডিত ও নানা গুণের অধিকারী হলেও, খামখেয়ালী, অবিবেচনা ও নিষ্ঠুরতার জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'পাগলা রাজা' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তা বলে তিনি উন্মাদ বা অর্দ্ধোন্মাদও ছিলেন না। তবে তাঁর পরিকল্পনাগুলি যেমন:—(ক) গঙ্গা যমুনার দোয়ার অঞ্চলে খাজনা বৃদ্ধি করা, (খ) দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর; (গ) তামার নোটের প্রচলন প্রভৃতি কতকগুলি কাজের ব্যর্থতার ফলে দিল্লীর সুলতানী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের সুলতান তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণের ফলে এ বংশের পতন ঘটে।

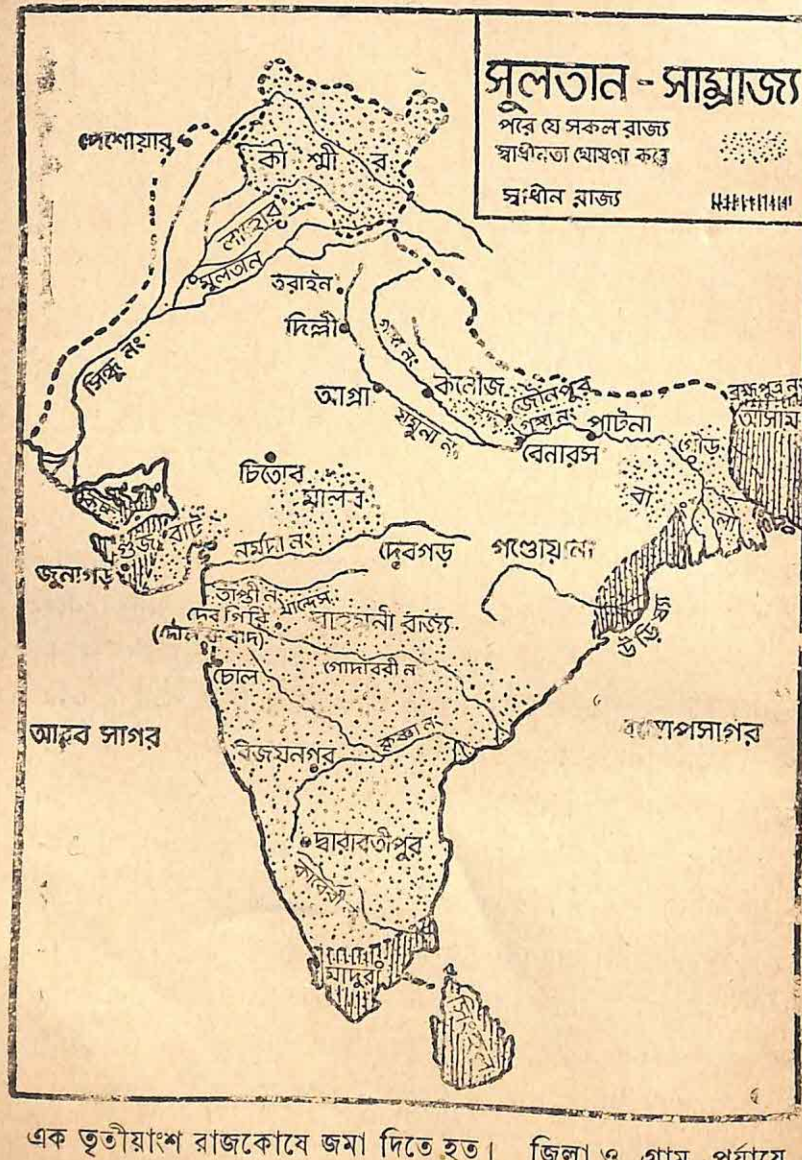


মহম্মদ বিন-তুঘলক

এরপর তুঘলক শাসনের অবসানে সৈয়দ বংশের রাজত্ব (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) শুরু হয়। ৩৭ বছর রাজত্বের পর লোদী নামে আর এক বংশের সুলতানরা সিংহাসন দখল করেন। এই বংশেরই তৃতীয় সুলতান ইব্রাহিম লোদী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খৃঃ) মধ্য এশিয়ার ফরগনার অধিপতি বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। লোদী বংশই ভারতে তুর্কী-আফগান সুলতানীর শেষ আলোক বর্ত্তিকা।

সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—সুলতানী শাসনের প্রধান দিকটি হল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ ও

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা। রাজকর্মচারীদের মাইনের বদলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার নিয়ম চালু ছিল। জমি থেকে উৎপাদনের



এক তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা দিতে হত। জিলা ও গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় কর্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব আদায় হত। এই কাজে নিযুক্ত

ছিলেন গ্রাম প্রধান বা মকদ্দম, জমিজমা ও খাজনাপত্রের নথিভুক্তকারী বা পাটওয়াড়ী এবং স্থানীয় রাজস্বের হিসাবপত্রের তদারককারী বা মুস্ত্রীফ।

সারা দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে সুলতানদের দরবারে থাকতেন কয়েকজন প্রধান কর্মচারী যেমনঃ- উজির (প্রধানমন্ত্রীর মত) বক্সী (সৈন্য বাহিনীর বেতন প্রদানকারী), কাজী, (প্রধান বিচারক ও ধর্মীয় বিষয়ে সুলতানের পরামর্শদাতা) ইত্যাদি।

সমস্ত উচ্চ রাজকর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকী করতেন উজীর।

উজীরের দক্ষতা ও পরামর্শের উপর সুলতান খুব নির্ভর করতেন। যদিও সর্ববিষয়ে সুলতানই নিতেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সুলতানী যুগে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রধানবৈশিষ্ট — তুর্কী-আফগান অভিযান ভারতে এনেছিলেন ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি। তাই ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সেগুলির প্রভাবে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়।

রাজনৈতিক জীবন– সুলতানী আমলের প্রথম দিকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কখনও খর্ব করা হয়েছে, কখনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অত্যাচার ও অবিচার হয়েছে তাঁদের উপর যথেষ্ট। ফলে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক হয়ে ওঠে অত্যন্ত তিক্ত। কিন্তু এ যুগেরই শেষের দিকে বিজয়ী বিজিতের বিরোধ অনেকটা কমে আসে ; বিশেষ করে আঞ্চলিক স্বাধীন সুলতানদের পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের ফলে !

অর্থ নৈতিক জীবন—রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এলেও হিন্দুদের অর্থ নৈতিক জীবন তেমন বদলায় নি। জায়গীরদার মুসলমান হলেও, চাষী হিন্দুই রয়ে গেল। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়েছে হিন্দু বণিক কারণ মুসলমানদের মধ্যে তখন অধিকাংশই ছিল সৈন্য। সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও সাধারণ লোক বিশেষতঃ কৃষক ও মজুর শ্রেণী চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করত।

সামাজিক জীবন—দীর্ঘকাল মুসলীম শাসনে থেকে হিন্দুদের সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাব পড়ে। প্রথম দিকে হিন্দু সমাজে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। নারী সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন হয়। আচার-নিষ্ঠার জোরে হিন্দুধর্ম অনেকটা রক্ষা পায়। কিন্তু সমাজের নীচের তলার মানুষদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার জন্যে দুঃখ কষ্ট বেড়ে যায়। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্মগ্রহণের পথ তৈরী করে।

ভক্তি আন্দোলন—হিন্দু সমাজে স্পৃশ্যতা—অস্পৃশ্যতার অনেক বাছ বিচার ছিল। দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষের সরাসরি ঈশ্বর উপাসনার পথ ও ছিল না, অথচ ইসলামের সহজ সরল বিধি এইসব লাঞ্ছিত মানুষকে আকৃষ্ট করে। তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা করার জন্য ধর্মের ত্রুটি সংস্কার দরকার হল যাতে আচার-বিচার ছাড়াই সবাই ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে। সেই চিন্তা থেকেই দেখা দেয় ভক্তি আন্দোলন।

হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনে এক নতুন রূপ নিয়ে এল ভক্তি আন্দোলন। ইসলামধর্মে আছে সমতা ও একেশ্বরবাদ। ভক্তি আন্দোলন ও এইমতের পক্ষে সাড়া জাগাল। ধর্মে কোন জাতিভেদ কিম্বা বর্ণভেদ থাকবে না। কারণ ভগবানকে ভালবাসার অধিকার সকলেরই সমান। ধর্ম সংস্কারকগণ ভগবানকে পাওয়ার উপায় হিসেবে মানুষকেই ভগবান মনে করে ভালবাসার কথা বললেন। ভক্তি আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিলেন তাদের কয়েকজন হলেন কবীর, শ্রীচৈতন্য ও নানক।

মধ্য যুগেরকয়েকজন ধর্ম সংস্কারক ঃ

কবীর—বিখ্যাত ভক্তিবাদের প্রচারক রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন মুসলমান সাধক কবীর। তিনি প্রচার করেন যে হিন্দুর রাম ও মুসলমানের রহিন বা আল্লা এক এবং অভিন্ন। তাঁর কাছে ধর্মের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিনি বলতেন যে, অন্যায়, অশুচি এবং পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ জীবন যাপনই ঈশ্বর লাভের উপায়।

কবীর-দুই পংক্তির কবিতা রচনা করে সেগুলির মাধ্যমে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এগুলি কবীরের দোঁহা নামে পরিচিত।



কবীর

শ্রীচৈতন্য ঃ বাংলা দেশে ভক্তি-আন্দোলনের জোয়ার আনলেন



শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য। ভক্তি ও ভালবাসার মধ্যদিয়ে ভগবানকে পাওয়ার পথ

তিনি দেখিয়েছিলেন। সকল জীবের প্রতি প্রেম ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ভাব প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোককেও তিনি শিষ্যরূপে নিয়েছেন যেমন, 'যবন হরিদাস'। ফলে হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও বর্ণাশ্রমের কড়াকড়ি অনেক কমে যায়।

নানক ঃ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অপর একজন ধর্ম সংস্কারক ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। তিনি বলতেন, ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হলেও, ঈশ্বর একজনই মাত্র। তিনি জাতি, ধর্ম, উচ্চ-



নানক

নীচের কোন ভেদাভেদ মানতেন না। তাঁর মতে ভক্ত ও ভগবানের যোগসূত্র হল ঈশ্বরের নাম-কীর্তন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। নানকের ঈশ্বর উপাসনার স্তোত্রগুলি শিখদের ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থে রয়েছে। নানকের শিষ্যরাই হলেন শিখ।

হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব ও সংস্কৃতি সমন্বয় ঃ— হিন্দু মুসলিম দুটি শক্তিশালী সংস্কৃতি দীর্ঘদিন একে অপরের সংস্পর্শে আসার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার আচরণ, রীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটে। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফলে হিন্দুধর্মে যে প্রাণ-

চাঞ্চল্য আসে উহার প্রভাবে ইসলামও নমণীয় হয়ে হল ভারতীয়। ফলে হিন্দু-মুসলিম ব্যবধান কমে গিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে সেতু রচনা করে। বাউল, পীর ও গাজীর গান হয়েছে এই সমন্বয়ের বাহক।

ধর্মের চাইতেও সাহিত্য, শিল্প, ভাষা ও অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে অনেক বেশী। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যুগের হিন্দুগণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলিমগণ সংস্কৃত, সাহিত্য ও আঞ্চলিক ভাষার চর্চা শুরু করেন। ফারসী ভাষায় হিন্দুদের আগ্রহ থেকে হিন্দি ভাষার মিশ্রনে উদু ভাষার উৎপত্তি হয়। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হতে থাকে। প্রাদেশিক শাসকদের উৎসাহে আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ইলিয়াস শাহী আমলে বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল,' মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের স্রোতও সৃষ্টি হয় এ যুগেই।

ইলিয়াসশাহীযুগে বঙ্গদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা :—দিল্লীর সুলতানী যুগের শেষের দিকে যেসব আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে বঙ্গদেশ একটি। এখানে স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে দুটি বংশ বিখ্যাত—একটির স্থাপয়িতা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪৬ খ্রীঃ), অপরটির স্থাপয়িতা হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রীঃ)।

হুসেন শাহ যদিও ইলিয়াস শাহী বংশের কেউ নন, তথাপি যুগের চরিত্র বিচারে ইলিয়াস শাহী বংশের সঙ্গেই তাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়। উভয় বংশের আমলে বঙ্গদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

সামাজিক অবস্থা—ইলিয়াস শাহী যুগে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ফলে সামাজি রীতি-নীতির আদান-প্রদান ঘটে। যেমন, হিন্দুদের বৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক স্তরভেদ মুসলিম সমাজেও সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক হোলি ও মহরমে যোগ দিত। চীনা-পর্যটক মা-হুয়ান বাঙ্গালীর আতিথেয়তার খুব প্রশংসা করেছেন।

অর্থ নৈতিক উন্নতি : এই যুগে অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিকে কেন্দ্র করে। শান্তি শৃঙ্খলা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যও বেড়েছে। ধনাগম

থেকে সমৃদ্ধিও এসেছে। কৃষিজাত পণ্যের দাম খুবই কম ছিল। কৃষকের অবস্থা কিন্তু মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনবতুতার বিবরণে জানা যায় যে, সে সময় বঙ্গদেশে টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত। একটি দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ছিল মাত্র তিন টাকা।

সাংস্কৃতিক সাফল্য ঃ বঙ্গদেশে সাংস্কৃতিক সাফল্যের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হল ইলিয়াস শাহী যুগে। ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সেকেন্দর শাহ স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সেকন্দর শাহ নির্মাণ করেন। ইলিয়াসের পৌত্র গিয়াসুদ্দিন ছিলেন সুকবি ও ন্যায়পরায়ণ। এ যুগে বঙ্গদেশে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার বিশেষ উন্নতি হয়। হুসেন শাহ ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁর সময়ে বহু মসজিদ ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তার আনুকুল্যে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করে হুসেন খাঁর কাছ থেকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

অনুশীলনী

ভাল করে মনে রাখবে ঃ

১। দিল্লীব তুর্কী-আফগান সুলতানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহম্মদ ঘোরী। তাঁর অবর্তমানে কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কুতুবউদ্দিন থেকেই দাস বংশের উৎপত্তি। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস ও বলবন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। দাস বংশের পর এল খলজী বংশ। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান দিলেন আলাউদ্দিন খলজী। তারপর শুরু হয় তুঘলক বংশ। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘলক। এরপর দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করে সৈয়দ ও লোদী বংশ। লোদী বংশই ভারতে তুর্কী-আফগান সুলতানীর শেষ আলোক শিখা।

৩। সুলতানী যুগে ইসলামের সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজ প্রথম প্রতিরোধ করলেও ধর্ম সংস্কার বা ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে ছিলেন কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রভৃতি।

৪। সুলতালী যুগের শেষের দিকে বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়ে ওঠে। এখানকার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শামসুদ্দিন ইলিয়াস ও হোসেন শাহ বিখ্যাত।

অভীক্ষণ

মুখে মুখে উত্তর দাও: মামুদ ও ঘোরী কোথাকার লোক ছিলেন? দাস বংশের প্রধান দু'জন সুলতানের নাম বল। খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? কোন কোন ঐতিহাসিক কা'কে পাগলা রাজা বলেছেন? ভক্তি-আন্দোলনে কয়েকজন ধর্ম-সংস্কারকের নাম বল। বঙ্গের দু'জন বিখ্যাত স্বাধীন সুলতানের নাম বল।

আত্মসমীক্ষা

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর:** মামুদ ও ঘোরী — দুই রাজ্যের — — অধিপতি হলেও তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ার —। দাশ বংশের অবসানে — বংশের রাজত্ব শুরু হয়। ভক্তি আন্দোলন হল — সংস্কারের নামান্তর মাত্র।

২। **সংক্ষেপে উত্তর লেখ:** (ক) সুলতান মামুদ ও ঘোরীর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি একই প্রকারের ছিল না কেন? (খ) মহম্মদ বিন তুঘলককে কেউ কেউ কেন 'পাগলা রাজা' বলেছেন? (গ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কার কার সঙ্গে ঘটে? (ঘ) সুলতানী যুগে ভারতের সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি। (খ) ভক্তি আন্দোলন কাকে বলে? (চ) হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় বলতে কি বুঝ?

৩। **পূর্ণাঙ্গ উত্তর লেখ:** তুর্কী আমলে বঙ্গদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা আলোচনা কর।

করণীয় কাজ: তুর্কী-আফগান সুলতানী যুগে বিভিন্ন রাজ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের রাজত্বকাল দেখিয়ে একটি সময়রেখা তৈরী করবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
মধ্য যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের জন্ম

কনস্টান্টিনোপলের পতন ও নব জাগরণের উপর প্রভাব—মধ্য যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলির পারস্পারিক সংঘাতের ফলে এক নতুন ইতিহাসের জন্ম সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতন এই প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করে। তাই ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ। ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় থেকেই ইউরোপে মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়।

মধ্যযুগে পুরাতন লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। এর পতনের ফলে গ্রীক ও ল্যাটিন পণ্ডিতগণ দলে দলে পশ্চিম ইউরোপের নানাদেশে বিশেষ করে ইটালিতে আশ্রয় নেন। তাদের সঙ্গে ছিল সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটলের অমূল্যগ্রন্থ। এসব পণ্ডিতদের চেষ্টায় গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির নতুন করে চর্চা শুরু হয়। ফলে মানুষের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে—যা রেঁনেসাস বা নবজাগরণরূপে খ্যাত।

নব যুগের প্রস্তুতি ও যশস্বী স্রষ্টা—নবজাগরণের ধারা কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের পতনের বেশ আগে থেকেই বয়ে চলেছিল, বিশেষ করে ইটালিতে। ফ্লোরেন্সের কবি দান্তে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ডিভাইন কমেডি ইটালীয়ভাষায় রচনা করেন। পেত্রার্ক ও বোকাচিও স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করেন। এ ছাড়া, হিউম্যানিষ্ট বা মানব-দরদীরূপে খ্যাত কয়েকজন মনীষীর অবদান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেনেসাঁস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—নব জাগরণের ফলে মধ্য যুগের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বদলে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় যুক্তি ও জিজ্ঞাসা। পুরনো বিধি-বিধানের নাগ পাশ থেকে মুক্তি লাভ

করে তাদের মধ্যে প্রকৃতিকে জানার অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। এ থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। কাগজ ও ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে নতুন শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ও গণসংযোগ সম্ভব হল। কম্পাস আবিষ্কৃত হওয়ায় সমুদ্রপথে যাত্রার ভয় কেটে গেল। কোপারর্নিকাস প্রমাণ করলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে।

নবজাগরণ আন্দোলনের আর এক বৈশিষ্ট্য হল ভৌগলিক আবিষ্কার। কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ম্যাগেলান প্রভৃতি ভৌগলিক আবিষ্কারক নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ গড়ে তোলেন। এদের সংস্পর্শে ধনী হল ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

ভৌগলিক আবিষ্কারের ফল :—এইসব নব নব আবিষ্কৃত দেশের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। পণ্য-সংগ্রহের প্রতিযোগিতা থেকে ইউরোপের সম্প্রসারণ ঘটে। **অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ ক্রমশঃ রাজনৈতিক প্রভুত্বের পথ সুগম করে। ফলে** ইউরোপীয়রা পৃথিবীর নানাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। এদিকে বাণিজ্য করে ধনশালী বণিকরা গিল্ডের মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অর্জন করে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সামন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

ইউরোপে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের উত্থান :—পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের মধ্য থেকেই মানুষ পেল একই ভৌগলিক সীমার মধ্যে ধর্ম, ভাষা, আচার ব্যবহারের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষদের মধ্যে এক জাতি এক প্রাণ ও একতার ভাব ফুটে ওঠে। এই ভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ও পর্তুগালে এরূপ জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই

জাতীয় চেতনা থেকেই স্পেনের অধীন নেদারল্যাণ্ড বিদ্রোহ করে। শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলি স্পেনের অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাধীন ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

পুরাতন ও নতুনের সংঘাতঃ—পুরাতনের গর্ভ থেকেই হয় নতুনের জন্ম। স্বাভাবিক কারণেই পুরাতনহয়ে পড়ে জীর্ণ আর নতুন হয়ে ওঠে প্রাণ-চাঞ্চল্যে উচ্ছল। পুরনোর আবরণ ছিন্ন করে জন্ম-মুহূর্তে নতুনের সংঘাত ঘটে পুরনোর সাথে। মধ্য যুগের শেষে ও আধুনিক যুগের সূচনায় তেমনি ঘটেছে এক সংঘাত। এই সংঘাত ঘটেছে অমর্ত বনাম মর্ত কেন্দ্রিক জীবন বোধে ; সামন্ত বনাম বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ; ব্যাক্তি অধীনতা বনাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় ; কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বনাম জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসায়। এছাড়া অনুন্নত ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি এবং অখণ্ড খৃষ্টান সাম্রাজ্য ও জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবন হতে সামন্ত ব্যবস্থার অবসান ও ব্যাক্তির শ্রমে উৎপন্ন শিল্পের প্রসার ঘটে।

এভাবে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়ায়। বণিক যুগের আবির্ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম উদারনীতির সূচনা হয় ইংলণ্ডে। সেখানে উদীয়মান বণিক শ্রেণীর প্রভাবের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল যাজক ও সামন্ত প্রভুরা রাজাকে সমর্থন করে। ফলে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অবাধ রাজশক্তি সংকুচিত হয়ে নিয়মের মধ্যে আসতে বাধ্য হয়। একেই বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রের সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি স্পষ্ট করে বলা হল, ঘোষিত হল গণতন্ত্রের মহিমা। মানুষ এগিয়ে চলল, নবযুগের আলোকিত পথে। এসব কথা তোমরা জানবে অষ্টম শ্রেণীতে।
